আইআইআইটি অকেশনাল পেপার সিরিজ

ড. এম উমর চাপরা

# মাকাসিদ আল-শরিয়াহর আলোকে উন্নয়ন ইসলামিক মডেল

মাকাসিদ আল-শরিয়াহ'র আলোকে

# উন্নয়ন ইসলামিক মডেল

মূল
ড. এম উমর চাপরা

বাংলা অনুবাদ
ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

সম্পাদনা
আহমদ হোসেন মানিক

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

মাকাসিদ আল-শরিয়াহ'র আলোকে

# উন্নয়ন ইসলামিক মডেল

ড. এম উমর চাপরা

অনুবাদস্বত্ব
বিআইআইটি

প্রকাশক
**বিআইআইটি পাবলিকেশন্স**
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩৯৪৯, ০১৪০০ ৪০৩৯৫৮

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মূল্য
১৫০.০০ টাকা

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৮১২৯-২-০

Bengali version of '*The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*'; published by BIIT Publications; 302, Books and Computer Complex Market (2nd Floor), 38/3, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh, E-mail: biitpublications@gmail.com; publication: September 2023 Price: Tk 150.00

## আইআইআইটি অকেশনাল পেপার সিরিজ প্রসঙ্গে

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি) *দ্য ইসলামিক ভিশন অব ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য লাইট অব মাকাসিদ আল-শরিয়াহ* (ইসলামী আইনের উচ্চতর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য)-এর ওপর এ অকেশনাল পেপারটি উপস্থাপন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। লেখক ড. এম উমর চাপরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ এবং স্কলার।

যেহেতু *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ* বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় খুব অল্প কাজ পাওয়া গেছে, তাই আইআইআইটি এ গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন ক্ষেত্রটিকে পরিচিত করার জন্য *আল-মাকাসিদের* ওপর একাধিক বইয়ের অনুবাদ ও প্রকাশনা শুরু করার মাধ্যমে শূন্যতা পূরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ পর্যন্ত এর মধ্যে রয়েছে *ইবন আশুর ট্রিটিজ অন মাকাসিদ আল-শরিয়াহ*, আহমদ আল-রাইসুনির *ইমাম আল-শাতিবিস থিওরি অব দ্য হায়ার অবজেকটিভস অ্যান্ড ইনটেন্টস অব ইসলামিক ল*, গামাল এলদিন আত্তিয়ার *টুওয়ার্ডস রিয়েলাইজেশন অব দ্য হায়ার ইনটেন্টস অব ইসলামিক ল : মাকাসিদ আল-শরিয়াহ এ ফাঙ্কশনাল অ্যাপ্রোচ* এবং জাসের আওদার *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ অ্যাজ ফিলোসফি অব ইসলামিক ল : এ সিস্টেমস অ্যাপ্রোচ*।

যেহেতু বিষয়টি জটিল ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চ্যালেঞ্জিং এবং বেশিরভাগ গ্রন্থই শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ, স্কলার এবং বুদ্ধিজীবীদের জন্য লেখা, তাই আইআইআইটি লন্ডন অফিস সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজলভ্য ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ করার লক্ষ্যে অকেশনাল পেপার সিরিজের অংশ হিসেবে অন্য আরো সহজ পরিচিতি নির্দেশিকাও তৈরি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ হাশিম কামালির *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ মেইড সিম্পল* এবং জাসুর আওদার *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ : এ বিগিনারস গাইড*।

আনাস এস. আল শায়খ-আলি
অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজার, আইআইআইটি, লন্ডন অফিস

# সূচি

সূচনা ॥ ৭

*শরিয়াহ'র মাকাসিদ* (উদ্দেশ্যসমূহ) (চিত্র ১) ॥ ১০

মানুষের প্রবৃত্তিকে *(নাফস)* উদ্দীপ্ত করা (চিত্র ২) ॥ ১২

বিশ্বাস, বুদ্ধি, প্রজন্ম এবং সম্পদ সমৃদ্ধকরণ ॥ ২৭

বিশ্বাস *(দীন)* শক্তিশালী করা (চিত্র ৩) ॥ ২৭

রাষ্ট্রের ভূমিকা ॥ ৩৪

বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধকরণ *(আকল)* (চিত্র ৪) ॥ ৩৬

ভবিষ্যৎ বংশধারার সমৃদ্ধকরণ *(নাসল)* (চিত্র ৫) ॥ ৪০

সম্পদের উন্নয়ন ও পরিবর্ধন (চিত্র ৬) ॥ ৪৪

উপসংহার ॥ ৪৭

টীকা ॥ ৪৯

গ্রন্থপঞ্জি ॥ ৫৯

## সূচনা

ইসলামের সকল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির কল্যাণ সাধন। এটিই আল্লাহর প্রথম উদ্দেশ্য, যার জন্য তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা.-কে এই বিশ্বে প্রেরণ করা হয়েছিল (আল-কুরআন, ২১:১০৭)।[১] ইসলামের এ উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম মাধ্যম বা উপায় হচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আর্থিক সামর্থ্য নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের *ফালাহ* তথা প্রকৃত কল্যাণ অর্জনের চেষ্টা করা।[২] *ফালাহ* শব্দটি কুরআনে ৪০ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে; 'ফালাহ' শব্দের প্রতিশব্দ *ফাউয* কুরআনে ২৯ বার উচ্চারিত হয়েছে। বিশ্বাসীদের দিনে ৫ বার আজানের মাধ্যমে কল্যাণের পথে আহ্বান করে মুয়াজ্জিন মূলত ইসলামের বিশ্বদর্শনের গুরুত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেন।

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, মানুষের কল্যাণ সাধন বা তার উন্নতি অর্জন– এটি শুধু ইসলামেরই নয়, বরং পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজ-সভ্যতারই উদ্দেশ্য। এটি অবশ্যই সত্য। পৃথিবীর সব সমাজেই মানুষের উন্নয়নের মূল মাপকাঠি হলো মানুষের কল্যাণ কতটুকু নিশ্চিত হয়েছে তা। কিন্তু মানুষের 'উন্নতি' বা 'কল্যাণ' বলতে কী বুঝায় সে প্রশ্নে ইসলাম এবং অন্যান্য সভ্যতা বা মতাদর্শের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এছাড়াও উন্নতি অর্জনে ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কেও ইসলামের সাথে অন্য মতাদর্শের ভিন্নতা লক্ষণীয়। এ পার্থক্যটুকু থাকতো না যদি পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের কল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের অর্থব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতো।[৩] বাস্তবতা হচ্ছে কালের বিবর্তনে ধর্মপ্রদত্ত নীতিবোধ থেকে রাষ্ট্র বা সমাজগুলো দূরে সরে গেছে। এছাড়াও ইউরোপে শিল্পবিপ্লব এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানালোকিতকরণ আন্দোলন (Enlightenment Movement) পৃথিবীর সকল দেশ এবং সমাজকে সেকুলার এবং পুঁজিবাদী মানসিকতার দিকে ধাবিত করতে সক্ষম হয়। এরই ফলে উন্নয়ন এবং অর্থব্যবস্থা বিষয়ে

ধর্মীয় নীতিবোধ প্রায়ই উপেক্ষিত হয়েছে। কালক্রমে উন্নয়ন বলতে শুধু অর্থ আর সম্পদের উন্নয়নের বিষয়টিই মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। অবশ্য ইদানীং পৃথিবী জুড়ে ধর্মীয় পণ্ডিত, সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের মাধ্যমে এ প্রশ্ন আবারো উত্থাপিত হচ্ছে যে, শুধু অর্থ-বিত্তের উন্নয়ন মানেই কি মানুষের উন্নয়ন? মানুষের মন-মনন-আধ্যাত্মিকতা আর ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ছাড়া কি মানুষের কল্যাণ সম্ভব?[৪] তাঁরা জোরালোভাবে গত কয়েক শতকে মানুষের মানবিকতার বিকাশের বিষয়টি পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় উপেক্ষিত হওয়ার কথাটি বলছেন।

গবেষণায় এটিও প্রমাণিত যে, মানুষের আত্মা এবং আত্মিক খোরাক বাদ দিয়ে শুধু পার্থিব সম্পদ এবং সম্ভোগক্ষমতা বৃদ্ধি তার জীবনকে সুখময় করার বদলে যন্ত্রণাই বাড়ায়। গত মহাযুদ্ধের পর বেশ কয়েকটি উন্নত দেশে একদিকে যেমন ব্যাপক আর্থিক উন্নতি এবং গড়পরতা আয় বেড়েছে, অন্যদিকে সমাজের আর সব উন্নয়ন সূচক যথা মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন, নবীন-প্রবীণের সুসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অবনতি হয়েছে।[৫] মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধির সাথে যে সুখ অর্জিত হয় তা মানুষের কয়েকটি মৌলিক চাহিদা অর্জনের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়; অতঃপর মানুষের সুখ তার আর্থিক সংগতি বৃদ্ধি করেও বাড়ানো সম্ভব নয়। এর চেয়ে বেশি সুখ অর্জন করতে হলে মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার খোরাক যোগাতে হয় যা অর্থ-বিত্ত দিয়ে কেনা যায় না।[৬] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান অর্থনৈতিকভাবে এক পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে; অথচ সেই দেশে আত্মহত্যার প্রবণতা বিশ্বে সর্বোচ্চ। এখানে বুঝতে হবে এটিই পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা। অনেক আধুনিক অর্থনীতিবিদও সংকীর্ণ চিন্তাধারায় সীমাবদ্ধ। তারা মানুষের উন্নয়ন বলতে তার অর্থ-বিত্তের উন্নয়নই বুঝেন। যেহেতু আধ্যাত্মিক-মানসিক-আত্মিক উন্নতির বিষয়টি প্রচলিত আর্থিক উন্নতির মাপকাঠি দিয়ে গণনা করা যায় না, সেহেতু এসব বিষয়ের উন্নতি নিয়ে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ আলোচনায় অক্ষম। তাই তারা এসব আলোচনা এড়িয়ে চলেন।

বস্তুগত উন্নতির উর্ধ্বে মানুষের সুখ এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মানুষের মানসিক শান্তি, আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি। বস্তুত এই বিষয়গুলো কখনো টাকা দিয়ে কেনা যায় না। মানসিক শান্তি এবং আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য অন্য আরো কিছু বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এসবের মাঝে আছে ইনসাফ, মানব-ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগিতা, দরদি সমাজব্যবস্থা

যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত থাকে এবং সমাজের সকল মানুষ উন্নয়নের সকল সুফল সমানভাবে ভোগ করতে পারে ইত্যাদি। একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার উন্নয়ন। কারণ আধ্যাত্মিকতা বিকাশের মাধ্যমেই মানুষ অল্পে তুষ্ট হওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে পারে। এই মানসিকতা ছাড়া হৃদয়ের অতৃপ্তি দূর হবে না। সুখের জন্য আরও যা প্রয়োজন তা হচ্ছে জীবন-সম্পদ-সম্মান বিষয়ে নিরাপত্তাবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা, সুশিক্ষার অধিকার, যথাসময়ে বিয়ের অধিকার, সন্তান লালনপালনের সুযোগ-সুবিধা, সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা কমানো, সমাজ থেকে অসম এবং অন্যায় প্রতিযোগিতা, হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানি কমানো ইত্যাদি। যদিও উন্নয়নের পশ্চিমা ব্যাখ্যায়ও এসব উপাদানের অনেকগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে, তবুও আধ্যাত্মিক উপাদানের বিষয়টি পশ্চিমারা এখনো অনুধাবন করতে পারেনি। বাস্তবে পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ছাড়া মানুষ তার জাগতিক উন্নয়নকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না।

ইসলাম যদিও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় ও সম্পদের বৃদ্ধিকে মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, তবুও মানবকল্যাণের জন্য এর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু এর দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। ইসলামে রয়েছে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ব্যবস্থা। এখানে মানুষের প্রবৃত্তি সংযত হয়ে প্রশান্ত আত্মা *(নাফসে মুতমায়িন্না)* অর্জিত হয়, যে আত্মা সব সময় সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। কুরআন বিভিন্ন লুপ্ত সভ্যতার উদাহরণ দিয়ে বলেছে, যখনই মানুষ আধ্যাত্মিকতাবিহীন জাগতিক উন্নয়নের জোয়ারে গা ভাসিয়েছে তখনই সেসব সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেছে। ফেরাউনি, ব্যাবিলনীয়, লুত আ.-এর কওম, আদ-সামুদ প্রভৃতি জাতির কথা কুরআনে এসেছে। মানুষের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক দিকসমূহের সুষম কল্যাণে ইসলামী *শরিয়াহর* যে বিধান তাকেই বলা হয় *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ* (*শরিয়াহর* মূল লক্ষ্য) [পাঠের সুবিধার্থে এই পুস্তকে পরবর্তীতে শুধু *মাকাসিদ* শব্দটি ব্যবহার করা হবে]। সামনের অধ্যায়গুলোতে *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্যসমূহ, তাদের প্রতিটির গুরুত্ব, একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক, মানবজীবনের ওপর এদের প্রভাব এবং সার্বিকভাবে মানবকল্যাণে *মাকাসিদের* আলোকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করা হবে।

## *শরিয়াহ'র মাকাসিদ (উদ্দেশ্যসমূহ) (চিত্র ১)*

*মাকাসিদ আল-শরিয়াহ'র* বিভিন্ন উপাদান হয় সরাসরি কুরআন অথবা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে অথবা কুরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামী পণ্ডিতগণ প্রণয়ন করেছেন।[৭] এই উপাদানগুলোর সবই *শরিয়াহর* দুটো প্রধান মৌল উদ্দেশ্য যথাক্রমে সকল মানুষের কল্যাণসাধন *(জালব আল-মাসালিহ)* এবং তাদের যে কোনো ক্ষতি থেকে সুরক্ষার *(দাফ আল-মাফাসিদ)* মধ্যে নিহিত রয়েছে।[৮] হিজরি পঞ্চম শতকের প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালি (মৃত্যু ৫০৫ হি./ ১১১১ খ্রি.)[৯] *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্য বা *মাকাসিদ* হিসেবে পাঁচটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন :

> শরিয়াহর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। এ কল্যাণ নিশ্চিত করতে মানুষের ঈমান বা বিশ্বাস (দ্বীন); জীবন ও প্রবৃত্তি *(নাফস)*, তাদের বুদ্ধিমত্তা *(আকল)*, মানুষের বংশধারা/বৈচিত্র্য *(নাসল)*, এবং তাদের সম্পদ *(মাল)*-এর সুরক্ষা প্রয়োজন। যা কিছুই এ পাঁচটি মূল উদ্দেশ্যের নিরাপত্তা বা সুরক্ষা নিশ্চিত করে তা সবই জনস্বার্থ রক্ষাকারী এবং কাঙ্ক্ষিত; আর যা কিছুই এ পাঁচ উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা সবই জনস্বার্থবিরোধী, কাজেই এগুলোর অপসারণই কাঙ্ক্ষিত।[১০]

ইমাম আল-গাজ্জালির তিনশত বছর পর আরও একজন বড় *শরিয়াহ* পণ্ডিত ইমাম আবু ইসহাক আল-শাতিবি (মৃত্যু ৭৯০ হি./ ১৩৮৮ খ্রি.) গাজ্জালির দেওয়া উদ্দেশ্যসমূহকে নিশ্চিত করেছেন। এই পাঁচটি *মাকাসিদ* শুধু মানুষের কল্যাণের জন্যই নয়, জগতের সবার কল্যাণের জন্যই। কুরআন এবং সুন্নাহয় *শরিয়াহর* আরও কিছু লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে; তবে এ পাঁচটি হচ্ছে মূল বা প্রাথমিক লক্ষ্য *(আল-আসলিয়াহ)* এবং অন্যগুলোকে বলা যায় পরিপূরক লক্ষ্য *(তাবিয়াহ)*। তবে *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে হলে এর সংলগ্ন বা পরিপূরক লক্ষ্যগুলো সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ প্রায়ই সেগুলোর বাস্তবায়ন ছাড়া মূল লক্ষ্য বাস্তবায়ন অসম্ভব। সুপরিচিত আইনি প্রবাদবাক্য *আল-কাইদাহ আল-ফিকহিয়্যাতে* উল্লেখ আছে, যে পন্থা অবলম্বন ছাড়া কোনো অবশ্যপালনীয় কর্তব্য সম্পাদন করা যায় না, সেটিও অবশ্যকর্তব্য।[১১] এতসব পরিপূরক লক্ষ্যের মাঝে কোনো কোনোটিকে অন্যগুলো অপেক্ষা মানুষের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে; কিন্তু গত দেড় হাজার বছরের মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ঘাটলে এটিই বুঝা যায় যে,

*শরিয়াহর* প্রতিটি লক্ষ্যই মানবজাতির জন্য অপরিহার্য। কাজেই সব সময়েই নব নব প্রযুক্তি, আবিষ্কার, লাইফস্টাইল ইত্যাদি সবকিছুকে *মাকাসিদ* এবং *কাওয়ায়িদের* আলোকে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। এজন্য মুসলিম জাতিকে এবং বিশেষভাবে এর আইন প্রণেতাদের সবসময় যুগোপযোগী ও গতিশীল থাকতে হবে।

উম্মাহকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে গাজ্জালি ব্যবহৃত পরিভাষা *মাকাসিদের* প্রতিটি লক্ষ্যের 'সুরক্ষা' বলতে শুধু চলতি সময়ের স্থিতাবস্থাকেই বুঝায় না; বরং অনেক ক্ষেত্রেই নতুন আবিষ্কার বা প্রযুক্তির সংযোজনের জন্য বর্তমানের স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে উম্মাহর মাঝে কল্যাণকর উন্নততর প্রযুক্তির দুয়ার উম্মুক্ত করতে হবে। এটিই *মাকাসিদের* আসল বাস্তবায়ন। এজন্য দরকার যথাসময়ে যথাযথ *ইজতিহাদ* বা গবেষণা। তাই ইতিহাসে দেখা যায় মুসলিম আইনবিদরা যতদিন নতুন কিছুকে গ্রহণ করার জন্য যথাসময়ে *ইজতিহাদ* করেছেন, ততদিন উম্মাহ জ্ঞান-প্রযুক্তি-সভ্যতা- শিক্ষার শিখরে থেকে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। যখনই মুসলিমরা *ইজতিহাদের* দরজা বন্ধ করেছে, তখনই তাদের উন্নত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়েছে; অথবা তাদের উন্নত প্রযুক্তির জন্য অন্য সভ্যতার দ্বারস্থ হতে হয়েছে; তাদের সাংস্কৃতিক পরাজয় হয়েছে। এ বিষয়টি বিখ্যাত কবি-দার্শনিক আল্লামা ইকবাল পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি ততক্ষণ জীবিত, যতক্ষণ আমি চলাফেরা বা নড়াচড়া করি; আর যখন আমি অচল এবং অনড়, তখন প্রকৃতপক্ষে আমি জড়'।[১২] তাঁর কথায় বুঝা যায় সমাজ ও মানবজাতিকে গতিশীল, চির উন্নত রাখতে এর নেতৃত্ব এবং আলেম সমাজকে সব সময় *ইজতিহাদ* করতে হবে; নতুনের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে।

ইমাম গাজ্জালির পরের প্রায় সব *শরিয়াহ* ব্যক্তিত্বই গাজ্জালি বর্ণিত *মাকাসিদের* পাঁচটি মূল লক্ষ্যের সাথে একমত পোষণ করেছেন; যদিও এই পাঁচটির ধারাক্রম বিবেচনায় পণ্ডিতদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে মতভিন্নতা থাকতে পারে।[১৩] আল-শাতিবিও সব সময় গাজ্জালির ধারাক্রম অনুসরণ করেননি।[১৪] এমনটি হওয়া খুব স্বাভাবিক, কারণ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এবং ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার সমাধানের বিষয়ে বিবেচনা করতে গেলে সমস্যার প্রকৃতি ভেদে *শরিয়াহর* লক্ষ্য, বিবেচনার ধারাক্রম ভিন্ন হতে পারে। যেমন– গাজ্জালির মৃত্যুর একশত বছর পর ইমাম ফখরুদ্দিন আল-রাজি (মৃত্যু ৬০৬ হি./ ১২০৯ খ্রি.) তখনকার সময়ের বিবেচনায় *আল নাফস* বা মানুষের প্রবৃত্তির

সুরক্ষাকে পাঁচটি মূলনীতির সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন।[১৫] এটি এক হিসেবে যৌক্তিক মনে হয়, কারণ মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা; কাজেই সর্বাগ্রে তার প্রবৃত্তির উন্নয়ন গোটা বিশ্বজগতকে সুষম উন্নয়ন ও কল্যাণের দিকে ধাবিত করবে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, তিনি মানবজাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা তাদের উন্নয়নে সচেষ্ট হয় (আল-কুরআন, ১৩:১১)। *শরিয়াহ* মানুষকে নিজেদের সংস্কারের পাশাপাশি তাদের প্রভাবিত প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। তদনুসারে আমরা যদি মানুষের *নাফসকে* প্রথমে রাখি তাহলে চিত্র-১-এ দেখানো *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ* প্রকাশ করা যেতে পারে।

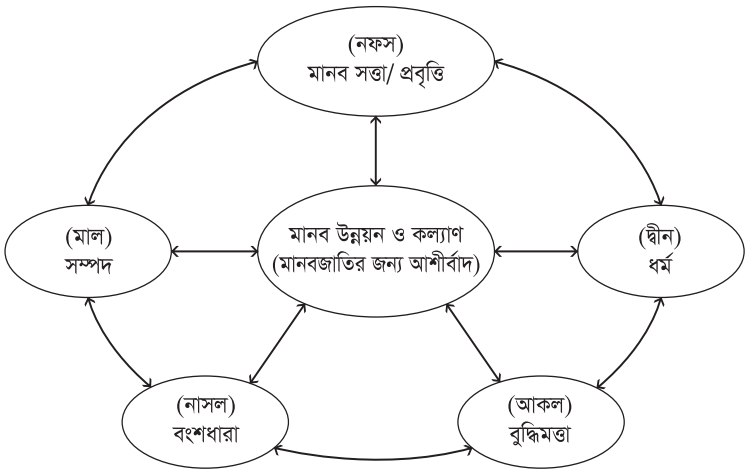


***চিত্র ১ :*** *মানব উন্নয়ন ও কল্যাণ বুঝা যাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি উপাদানের সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে।*

## *মানুষের প্রবৃত্তিকে (নাফস) উদ্দীপ্ত করা (চিত্র ২)*

যেহেতু মানুষের *নাফসের* উন্নয়ন *শরিয়াহর* পাঁচটি প্রাথমিক উদ্দেশ্যের একটি, তাই এ উদ্দেশ্যটি কীভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে তা দেখানো অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করে জানা প্রয়োজন মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলো সম্পর্কে। এই ন্যূনতম মৌলিক চাহিদার মধ্যে শুধু জীব হিসেবে বেঁচে থাকাই

নয়, বরং আল্লাহর খলিফা হিসেবে নিজে বেঁচে থাকা, নিজের বোধের উন্নয়ন এবং খলিফার দায়িত্ব পালনে সক্ষম থাকতে যা যা প্রয়োজনীয় তার সব অন্তর্ভুক্ত। মানুষের বিবেক বা প্রবৃত্তির উন্নয়নের উপাদানগুলো কুরআন এবং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে; এছাড়াও ইসলামী ফিকাহবিদগণও এসব উপাদান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মানুষের এসব মৌলিক চাহিদাপূরণ নিশ্চিত করতে পারলে তা মানুষের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করবে এবং মানুষের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও কল্যাণকর হবে।

বিবেকের উজ্জীবনের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে মানুষের মর্যাদা, আত্মসম্মানবোধ, মানব-ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সাম্য (চিত্র-২ দেখুন)। এক্ষেত্রে ইসলামের বিশ্বজনীন উদার দৃষ্টিভঙ্গি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, আল্লাহ মানুষকে উত্তম সত্তা *(ফিতরাত)* দিয়ে সৃষ্টি করেছেন (আল-কুরআন, ৩০:৩০); মানুষ নিষ্পাপ রূপেই জন্ম নেয় (আল-কুরআন, ৯৫:৪)।[১৬] মানুষের এটি দায়িত্ব, যেন সে তার অন্তর্নিহিত মহৎ সত্তা *(ফিতরাত)*-কে সুরক্ষা করে। মানুষকে এই উত্তম *ফিতরাত* দেওয়া ছাড়াও আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন সুমহান মর্যাদা– জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বংশ, আর্থিক সামর্থ্য নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবিক মর্যাদা সমান। কুরআনে বলা হয়েছে : 'আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীল করেছি' (আল-কুরআন, ১৭:৭০)। মানুষের এ মর্যাদা আরও বেড়েছে তার ওপর খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়ার মাধ্যমে (আল-কুরআন, ২:৩০)। সকল সৃষ্টি জগতের দেখভালের দায়িত্ব আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন; মানুষকে তার খলিফা বানিয়েছেন– এর চেয়ে সুমহান মর্যাদা আর কী হতে পারে? যেহেতু সব মানুষই আল্লাহর খলিফা, সেহেতু তারা সবাই সমান এবং পরস্পরের ভাই। কাজেই তাদের মধ্যে সমমর্যাদার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান থাকতে হবে। তাদের মাঝে সহনশীলতা, পারস্পরিক শুভকামনা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা থাকতে হবে। তাদের ওপর অর্পিত খেলাফতের আমানত সুরক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে (আল-কুরআন, ৫৭:৭)। মানুষের খেলাফতের দায়িত্বের আওতায় সমগ্র পৃথিবী। প্রাণীকূল, পক্ষীকূল ও পোকামাকড়, বৃক্ষলতা এবং পরিবেশ ইত্যাদি সবকিছুকে আল্লাহ যেভাবে যে বৈচিত্রে বিন্যস্ত করেছেন, তাকে সুরক্ষা করা মানুষের দায়িত্ব যাতে এগুলোর বর্তমান বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোনো ক্ষতি না হতে পারে।

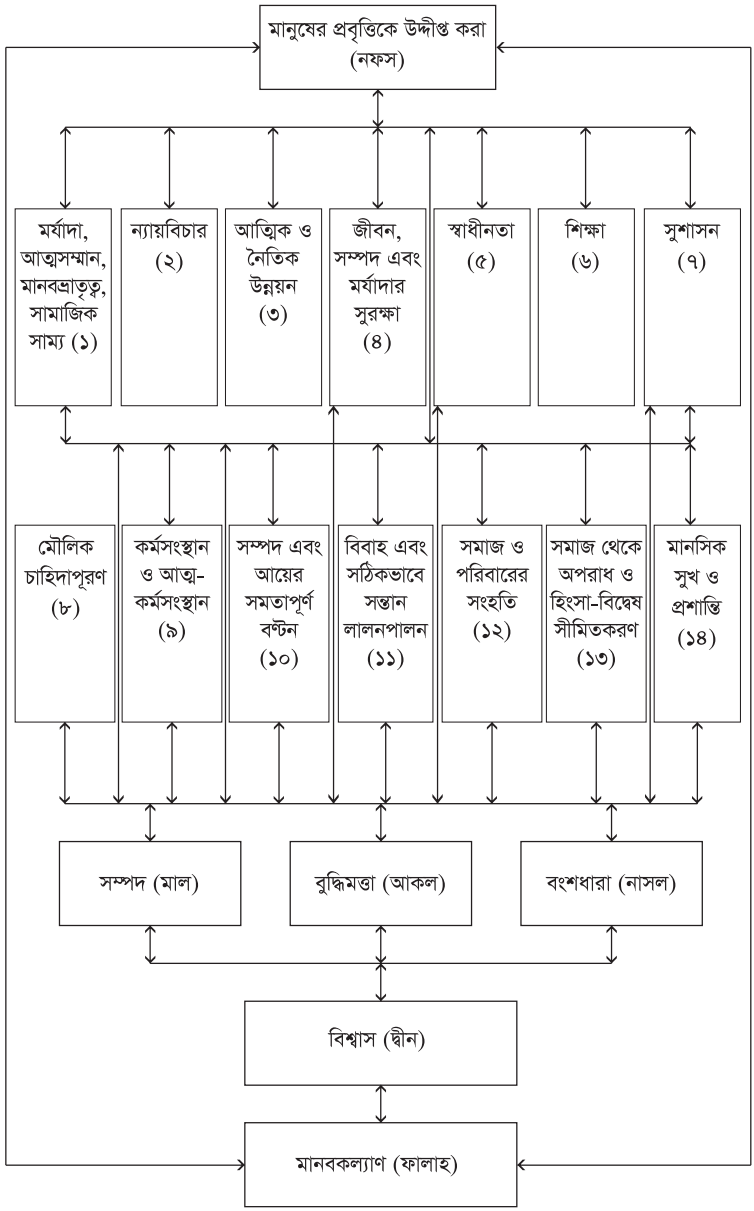
মানুষের প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করা (নফস)
মর্যাদা, আত্মসম্মান, মানবভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সাম্য (১)
ন্যায়বিচার (২)
আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়ন (৩)
জীবন, সম্পদ এবং মর্যাদার সুরক্ষা (৪)
স্বাধীনতা (৫)
শিক্ষা (৬)
সুশাসন (৭)
মৌলিক চাহিদাপূরণ (৮)
কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান (৯)
সম্পদ এবং আয়ের সমতাপূর্ণ বণ্টন (১০)
বিবাহ এবং সঠিকভাবে সন্তান লালনপালন (১১)
সমাজ ও পরিবারের সংহতি (১২)
সমাজ থেকে অপরাধ ও হিংসা-বিদ্বেষ সীমিতকরণ (১৩)
মানসিক সুখ ও প্রশান্তি (১৪)
সম্পদ (মাল)
বুদ্ধিমত্তা (আকল)
বংশধারা (নাসল)
বিশ্বাস (দ্বীন)
মানবকল্যাণ (ফালাহ)

*চিত্র ২*

তাই ইসলাম মানুষকে জন্মগতভাবে পাপী বলে মনে করে না। 'জন্মগত পাপী' ধারণাটি মানুষের মর্যাদার ক্ষেত্রে অবমাননাকর এবং তাই এটি ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির জন্য সম্পূর্ণ বিজাতীয়। পরম দয়ালু আল্লাহ কেন একজন জন্মগত পাপী সৃষ্টি করে তাকে অভিযুক্ত করবেন, যেবিষয়ে তার দোষ নেই? আদিপাপের ধারণাটি বুঝায় যে পাপপূর্ণতা জিনগতভাবে স্থানান্তরযোগ্য এবং প্রতিটি মানুষ ইতোমধ্যেই অন্যের ব্যর্থতা এবং পাপের দ্বারা কলঙ্কিত হয়ে এ পৃথিবীতে আসে। তদুপরি একজন 'ত্রাণকর্তা' যদি আদিপাপের জন্য তাকে 'প্রায়শ্চিত্য' করতে আসতে হয় যা তিনি করেননি, তবে তিনি কেন ইতিহাসে এত দেরিতে এসেছিলেন এবং পৃথিবীতে প্রথম মানব হিসেবে আসেননি? মানুষ জন্মগতভাবে পাপী হলে তাকে কীভাবে দায়ী করা যায় তার কাজের জন্য?

কুরআন মানুষকে যেকোনো আদি পাপের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছে; তাকে শুধু তার কাজের জন্য দায়বদ্ধ করেছে (আল-কুরআন, ৬:১৬৪; ১৭:১৫; ৩৫:১৮; ৩৯:৭; ৫৩:৩৮)। এটি আল্লাহর গুণ রহমান এবং রহিমের সাথে সাংঘর্ষিক (পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে) যা একজন মুসলিম তার জীবদ্দশায় প্রায়শই উচ্চারণ করে। এটি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে এ কারণে যে, তিনি প্রেমময় ও ক্ষমাশীল স্রষ্টা এবং তাঁর রয়েছে কল্পনা করা যায় এমন সব ভালো গুণ (আল-কুরআন, ৭:১৮০)। আশ্চর্যের কিছু নেই, এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী এবং রোমান্টিকরাও এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে মানুষের মাঝে অন্তর্নিহিতভাবেই আদি পাপ থাকে, যেমনটি প্রায় সব আধুনিক দার্শনিকরাও করেন।

একইভাবে, এনলাইটমেন্ট আন্দোলনের প্রভাবে পশ্চিমা দার্শনিকদের দ্বারা প্রবর্তিত 'নিয়ন্ত্রণবাদ' এবং 'অস্তিত্ববাদের' ধারণাও ইসলামের জন্য বিজাতীয়। ইসলাম কার্ল মার্কসের মতো মানবসত্তাকে কিছু বস্তুর সমন্বয় বলে মনে করে না, কিংবা সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতো শুধু মানসিক বা মনোদৈহিক সত্তা, লরেঞ্জের মতো শুধু প্রবৃত্তিপরায়ণ; বা ওয়াটসন, স্কিনার, পাভলভের ও অন্যদের মতো পরিবেশ ও প্রকৃতির সমন্বয় বলে মনে করে না।[১৭] মানুষের খলিফা হিসেবে দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা নিয়ন্ত্রণবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, বরং এটি মানুষের আত্মমর্যাদাবোধকে খাটো করে।[১৮]

সার্ত্রে (Sartre) বর্ণিত অস্তিত্ববাদ আরেকটি চরমপন্থি দর্শন– এটিও ইসলাম সমর্থন করে না।[১৯] সার্ত্রের মতে মানুষ শতভাগ স্বাধীন সত্তা, কোনোকিছুই

তার স্বাধীনতাকে সীমিত করতে পারে না, যদি না সে নিজ থেকেই তার স্বাধিকার সীমিত না করে।[২০] মানুষের প্রতিটি কাজই তার স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন; অতএব তার প্রতিটি কর্মের জন্য সে দায়িত্বশীল বা দায়বদ্ধ– সার্ত্রের এই যুক্তি অবশ্য নিয়ন্ত্রণবাদের চাইতে উন্নততর; কিন্তু সার্ত্রের মতবাদের সীমাবদ্ধতা এখানেই যে, তিনি মনে করেন মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা অবাধ, সীমাহীন। সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। তার জীবনের নেপথ্যে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য বা কার্যকারণ সক্রিয় নেই। বল্গাহীন ইচ্ছার বাস্তবায়ন করতে যেয়ে সে *নাফসের* দাসে পরিণত হয়। তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত কোনো বিধান বা প্লেটোনিক কোনো বিধান নেই। মানুষ যেন নিয়ন্ত্রণহীন, বেপরোয়া অথবা পরিত্যক্ত জীব; একমাত্র যে মূল্যবোধ তাকে চালিত করে তা হচ্ছে স্বাধীনতা, অবাধ স্বাধীনতা, ইচ্ছামতো যা কিছু করার অধিকার।[২১] সার্ত্রের 'স্বাধীনতা' দর্শনের সীমাবদ্ধতা এটিই যে, কোনো মানুষ তার ইচ্ছামতো সবকিছু নিজের সুবিধার অনুকূলে করতে থাকলে তার কাজ অন্যের স্বার্থহানি ঘটাতে পারে। যেহেতু স্বাধীনতা মানে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা– তাই একজনের ইচ্ছামতো কাজ যেন অন্যের স্বার্থহানি না ঘটায়, সেজন্য সার্ত্রের দর্শনের সীমাবদ্ধতাকে উপযোগিতাবাদের (Utilitarian) দর্শন দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমনি প্রতিটি মানুষের কল্যাণের বা সুরক্ষার অধিকারও আছে; কারো ইচ্ছা বা কাজের স্বাধীনতা যেন কারো সুরক্ষা বা কল্যাণের অধিকারকে নস্যাৎ না করে। এখানে দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্য দর্শন বহু গবেষণা করে যে অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তা দেড় হাজার বছর আগে ইসলামী *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্যেই বিবৃত ছিল *(হিফদ আল নাফস, হিফদ আল মাল, হিফদ আল আকল)*।

মানুষের বিবেকের উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় যে উপাদানটি প্রয়োজন তা হচ্ছে *ইনসাফ* বা *আদল* বা ন্যায়বিচার।[২২] সমাজ বা রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার না থাকলে মানুষের মর্যাদা, আত্মসম্মান, ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক সাম্য, কল্যাণবোধ সবকিছুতেই ঘুণে ধরে। কুরআন ন্যায়বিচার বা *ইনসাফ* প্রতিষ্ঠা করাকে আধ্যাত্মিকতা বা পরিশুদ্ধি অর্জনের সাথে তুলনা করেছে (আল-কুরআন, ৫:৮)। এই আধ্যাত্মিকতা বা পরিশুদ্ধি অর্জন ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিশুদ্ধ অন্তরের উঁচু আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ন্যায়বিচার বা *ইনসাফ* কায়েম করাটা আল্লাহর নবীদের মিশনেরও অন্যতম লক্ষ্য ছিল (আল-কুরআন, ৫৭:২৫)। কুরআন

দৃঢ়তার সাথে বলেছে ইনসাফ ছাড়া সমাজে শান্তি আসতে পারে না : 'প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও নিরাপত্তা তাদেরই জন্য, ঠিক পথে তারাই পরিচালিত যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের ঈমানকে জুলুমের দ্বারা বিনষ্ট করেনি' (আল-কুরআন, ৬:৮২)।[২৩] *ইনসাফ* কায়েমে ব্যর্থতা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বাড়াবে, আর শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংসের দিকেই নেবে; সে শূন্য হাতে হাশরের ময়দানে বিচারের মুখোমুখি হবে (আল-কুরআন, ২০:১১১)।

নবীও সা. অবিচারকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিন্দা করেছেন। তিনি *ইনসাফহীনতাকে* তুলনা করেছেন 'হাশরের ময়দানে ঘোর অমানিশা'[২৪]-এর সাথে। এখানে হাশরের ময়দানে অন্ধকারের উপমাটি প্রতীকী। এর মানে বেইনসাফি এবং জুলুমের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীকে যে অন্ধকার যুগে নিয়ে যায়, হাশরের ময়দানে সেই অন্ধকারই তাদের আচ্ছন্ন করবে। বেইনসাফি বা অবিচার সমাজ থেকে শান্তি এবং স্থিতিশীল উন্নয়নকে নির্বাসিত করে। এটি পৃথিবীর মানুষকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের বদলে প্রতিহিংসা, অনৈক্য, সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে চালিত করে। বেইনসাফি এবং ইসলাম একসাথে সহাবস্থান করতে পারে না। অবিচারের ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে 'জুলুম'। এই জুলুম বলতে শুধু বিচার ব্যবস্থায় বিপর্যয় নয়; বরং সমাজ ও রাষ্ট্রে যেকোনো অসাম্য, অবিচার, প্রতারণা, মিথ্যাচার, অধিকার হরণ, মানুষের মর্যাদার হরণ, মর্যাদার লঙ্ঘন সবকিছুকেই বুঝায়।[২৫]

কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত এই *আদল* বা *ইনসাফের* কথাই যুগে যুগে মুসলিম পণ্ডিতদের লেখায় উঠে এসেছে। আল মাওয়ারদি (মৃত্যু ৪৫০ হি./ ১০৫৮ খ্রি.) লিখেছেন, 'ইনসাফ সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে; এটি মানুষকে নিয়ম ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে; এটি সমাজ ও দেশকে উন্নতির দিকে চালিত করে; ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়; ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করে; জাতির নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে সংহত করে'। তিনি আরও লিখেছেন, 'বেইনসাফি এবং জুলুম সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী এবং মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে'[২৬]। ইবন তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮ হি./ ১৩২৮ খ্রি.) বলেছেন, 'ইসলামি সমাজব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা জরুরি। যেকোনো ব্যক্তি, গোত্র বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিচার বা জুলুম বন্ধ বা প্রতিহত করতে হবে। এই ন্যায়বিচার মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার

প্রাপ্য; এমনকি জালিম-অবিচারকারীকেও ন্যায়বিচার করতে হবে।'[২৭] ন্যায়বিচার বা *ইনসাফ* প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া একটি জ্ঞানগর্ভ উক্তি করেছেন। তা হচ্ছে, 'আল্লাহ ন্যায়-নীতি ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ বা রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখেন; এমনকি যদি তা অমুসলিমদের রাষ্ট্রও হয়। অন্যদিকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রও আল্লাহর অভিশাপে ধ্বংস হয় যদি তা ন্যায়বিচার কায়েমে ব্যর্থ হয়।'[২৮] ইবন খলদুন (মৃত্যু ৮০৮ হিজরি/ ১৪০৬ খ্রি.) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, ন্যায়বিচার বা *ইনসাফ* কায়েম করা ছাড়া একটি দেশের উন্নতি করা সম্ভব নয়।[২৯]

কোনো একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে *ইনসাফ* বা ন্যায়বিচার কায়েম করতে হলে ওই সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে কিছু আইনকানুন এবং রীতিনিয়ম মানতে হয়। নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া রাষ্ট্রের পক্ষেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বস্তুবাদী বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের জন্য অনুসরণীয় বিধানগুলোকে নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Values) বলে বর্ণনা করা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সততা, স্বচ্ছতা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয়, সহনশীলতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, বিনয়, পিতা-মাতা-শিক্ষক-বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, দরিদ্র-অভাবীদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা, অসুস্থদের জন্য যত্ন, নিজের সমাজের এবং পারিপার্শ্বিক সমাজের সবার অধিকার নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হওয়া ইত্যাদি। সমাজের প্রতিটি সদস্য উপরোল্লেখিত এসব দায়িত্বের বিষয়ে আন্তরিক থাকলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস বাড়ে; পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়; একে অপরের প্রতি বেশি দায়িত্ববান হয়; একে অপরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে; পারিবারিক এবং সামাজিক সংহতি বাড়ে; মানুষের সহনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুযোগ বাড়ে; পারস্পরিক হিংসা-বৈষম্য কমে যায় এবং সংঘাত বন্ধ হয়।[৩০] সমাজে এ ধরনের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক থাকলে জাতীয় উন্নয়নের এবং জাতির কল্যাণের পথ সুগম হয়। এ ধরনের সামাজিক সুসম্পর্ককে উন্নয়নের সামাজিক পুঁজি (Social Capital) বলা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন এবং বিবেকের উজ্জীবনের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নৈতিক উন্নয়ন। যদি সমাজের সব মানুষের পারস্পরিক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সার্বজনীন মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে হয়, তবে

আলাদাভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিটি মানুষের ভেতরের মানবিকতার উত্থান অপরিহার্য। সেজন্যই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিক পরিশুদ্ধিকে ইসলাম এত গুরুত্ব দেয়। *শরিয়াহর* অন্যতম মূল লক্ষ্য *হিফদ আল দ্বীন* অর্থাৎ মানুষের ঈমান বা বিশ্বাসের সংরক্ষণ চূড়ান্তভাবে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটায়।

ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং এর মূল্যবোধ মানব ব্যক্তিত্বের চতুর্থ অতীব প্রয়োজনকেও সম্বোধন করে যা জীবনের নিরাপত্তা, সম্পত্তি ও সম্মান। কুরআনে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বিনা কারণে কাউকে খুন করল [পুরুষ বা নারী এবং মুসলিম বা অমুসলিম নির্বিশেষে], সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল; আবার যদি কেউ একজন ব্যক্তিকেও রক্ষা করল সে যেন সমগ্র মাববজাতিকে রক্ষা করল' (আল-কুরআন, ৫:৩২)। ইসলাম মানুষের জীবনের যে মূল্য দিয়েছে; জীবন রক্ষার যে তাগিদ দিয়েছে– তা মূল্যহীন হয়ে যায় যদি ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো অমুসলিমের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। রাসূল মুহাম্মদ সা. তাঁর বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, 'তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত তেমনি পবিত্র যেমনটি পবিত্র আজকের এই দিন (হজের দিন), এই শহর (পবিত্র মক্কা নগরী)'।[৩১] হজ ইসলামের সর্বোচ্চ মর্যাদার ইবাদত। এই ইবাদতের সাথে মানুষের জীবন, সম্পদ এবং ইজ্জতের মর্যাদার তুলনা করে ইসলাম সার্বিকভাবে মানুষকে মর্যাদাবান করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবীয় ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্য পঞ্চম যে উপাদানটি প্রয়োজন তা হচ্ছে স্বাধীনতা। ইসলাম মানুষকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেছে। সে জন্মগতভাবেই স্বাধীন। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব তাকে করতে হয় না। তার এই স্বাধীনতা তাকে উদ্বুদ্ধ করে তার মাঝে লুকিয়ে থাকা সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নিজের এবং মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করতে। মানবজাতির ওপর আরোপিত মানুষের আনুগত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেওয়ার মিশন নিয়েই রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর আগমন (আল-কুরআন, ৭:১৫৭)। যেকোনো মানবীয় দাসত্ব, আনুগত্য বা অধীনতা তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক হোক, সেটি ইসলামের 'স্বাধীনতা' দর্শনের বিপরীত। ইসলামী মতে, এমনকি রাষ্ট্রও আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে না। ইসলামের এই শিক্ষার কারণেই দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর রা. ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'যেখানে আল্লাহ

মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে জন্ম দিয়েছেন, সেখানে কোন ধৃষ্টতায় তোমরা তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করো?'[৩২]

অবশ্য ইসলামের এই স্বাধীনতার দর্শন সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনে বর্ণিত বল্গাহীন স্বাধীনতা নয়। ইসলামে বর্ণিত মানুষের স্বাধীনতা আল্লাহপ্রদত্ত নৈতিক বিধান তথা ইসলামী *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত; এখানে একজন মানুষ স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কল্যাণই দেখবে না, বরং জগতের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। এখানে সে স্বাধীন সত্তা, সব সময় এই অনুভূতি তার মধ্যে জাগ্রত থাকবে যে তার প্রতিটি কাজ-কর্ম এবং ইচ্ছা বা চিন্তাও আল্লাহ অবগত আছেন; এর সবকিছুর জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহতায়ালা যখন তাঁর ফেরেশতাদের জানালেন যে, তিনি পৃথিবীতে স্বাধীন সত্তাধারী মানুষকে তাঁর খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন; তখনই ফেরেশতাদের এই শঙ্কা হয়েছিল যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করবে, তারা পৃথিবীতে হানাহানি ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে (আল-কুরআন, ২:৩০)। ফেরেশতাদের শঙ্কার বিষয়ে আল্লাহ নিরুদ্বেগ ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে তিনি মানুষকে তিনটি অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন। যার ফলে মানুষ পৃথিবীতে বিপর্যয়কারী হবে না, বরং আল্লাহর ইবাদতকারি হবে। এই তিনটি অমূল্য সম্পদের প্রথমটি হলো মানুষের বিবেক, যা মানব প্রকৃতির *(ফিতরাত)* স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। এই *ফিতরাত* দিয়েই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (আল-কুরআন, ৩০:৩০)। যে মানুষ তার বিবেক বা *ফিতরাতকে* ধ্বংস করে, সে নিজেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে উপনীত করে (আল-কুরআন, ৯৫:৫)। মানুষ যেন আল্লাহপ্রদত্ত মহাসম্পদ বিবেককে রক্ষা করতে পারে, সেজন্য আল্লাহ নিজে যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে পথনির্দেশনা *(হিদায়া)* দিয়েছেন। এই ওহিলব্ধ জ্ঞান মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহতায়ালার দ্বিতীয় মহামূল্যবান সম্পদ। এই নবুয়তের মিশন হচ্ছে মানুষকে দেওয়া আল্লাহর আরেকটি অমূল্য সম্পদ, যা মানুষকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে। নবুয়তের মিশনের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষকে সব সময় তার আল্লাহপ্রদত্ত গুরুদায়িত্বের কথা এবং আখিরাতের জবাবদিহির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, তাদেরকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের এবং পৃথিবীতে কল্যাণ সাধনের উপযোগী করে গড়ে তোলা।[৩৩] তৃতীয় যে অমূল্য সম্পদ আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন সেটি হচ্ছে তার বুদ্ধিমত্তা বা *আকল* (Intellect)। মানুষ তার বুদ্ধিমত্তাকে

বিবেকসম্মতভাবে ব্যবহার করলে নিজের এবং ইহজগতের কল্যাণের পথ নিজেই চিনে নিতে পারবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ষষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হচ্ছে তার বুদ্ধিমত্তা *(আকল)*। এই *আকল* উন্নয়নের প্রধান বাহন হচ্ছে শিক্ষা। এ শিক্ষা তখনই কার্যকরী শিক্ষা হবে যখন এটি দুটো কাজ করবে। প্রথমত, এ শিক্ষা সমাজ এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের উঁচু নৈতিক মানসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে; একই সাথে এ শিক্ষা নাগরিকদের হৃদয়কে উদার ও প্রশস্ত করবে এবং আল্লাহর খলিফা হিসেবে তাদের মাঝে বিশ্বজনীন কল্যাণভাবনা তৈরি করবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা তাদের এতটাই যোগ্য করবে যে তারা নিজের প্রয়োজনীয় কাজ দক্ষতা, যোগ্যতা ও সচেতনতার সাথে করতে সক্ষম হবে; একই সাথে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নতুন নতুন জ্ঞান এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হবে। কাজেই যেকোনো শিক্ষাব্যবস্থা স্থায়ীভাবে মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিকাশে সহায়ক হতে হলে সে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এ দুটো লক্ষ্য অর্জিত হতে হবে। মানুষ নিজের নৈতিক মান এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন ছাড়া কোনোভাবেই তার *আকলকে* সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারবে না। এজন্যই কুরআন ও সুন্নাহয় মানুষের *আকল* বা বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে শিক্ষার ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা ইসলামী *শরিয়াহর* তৃতীয় প্রধান লক্ষ্য *হিফদ আল আকল* অর্জনের উপাদানগুলো একটু পরেই আলোচনা করবো।

মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের সপ্তম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সুশাসন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন ছাড়া একটি সমাজের মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ব্যাহত হয়। সুশাসনের অভাবে সমাজে অরাজকতা দেখা দেয়, আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়; মানুষের মাঝে ভীতি এবং নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বিরাজ করে– এসব বিষয় মানুষের আত্মোন্নয়নের পথে বাঁধা।[৩৪] এ অবস্থায় সমাজে দুর্নীতি, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা বাড়ে; নিজেকে রক্ষায় ব্যস্ত মানুষ অন্যের প্রয়োজনের দিকে তাকাতে ভুলে যায়; সহমর্মিতা, সহযোগিতা লোপ পায়। ইসলামের ইতিহাস জুড়ে মুসলিম পণ্ডিতরা দেশ ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ পণ্ডিতদের মাঝে আছেন আবু ইউসুফ, আল-মাওয়ারদি, ইবন তাইমিয়া, ইবন খলদুন প্রমুখ। মুসলিম সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতাকে অনেকেই চিহ্নিত করেন।[৩৫]

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে ইসলামের দৃষ্টিতে অষ্টম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হচ্ছে সমাজ থেকে দারিদ্র্যের বিমোচন এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ। দারিদ্র্য একজন মানুষকে অক্ষম, নিরুপায় এবং পরনির্ভরশীল করে তোলে। রাসূল সা. বলেছেন, চরম দারিদ্র্য মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যেতে পারে।[৩৬] ইসলামের অন্যতম শিক্ষা মানুষের আত্মমর্যাদা, *ইনসাফ* ও সামাজিক ভ্রাতৃত্বের চেতনার জন্য দারিদ্র্য একটি চ্যালেঞ্জ। তবে এই দারিদ্র্য বিমোচন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন পুরো সমাজের অংশগ্রহণ। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সম্পদের সুষম ব্যবস্থাপনা ও বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। ইতোপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলাম মতে আল্লাহ মানুষকে যত নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন অর্থাৎ তার সম্পদ, স্বাস্থ্য, জ্ঞান ইত্যাদি সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আমানতস্বরূপ; এই আমানতের অন্যতম দাবি হলো মানুষ তার এসব সম্পদ এমনভাবে খরচ করবে যে, সমগ্র মানবতা তাতে উপকৃত হবে।

ইসলামের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন ফিকাহ-পণ্ডিতের রচনায় এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্যে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, দরিদ্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের কাজটি সমাজের সক্ষম মানুষের জন্য *ফরজে কিফায়া*।[৩৭] এমনকি আল-শাতিবির মতে এটি হচ্ছে সমাজের অস্তিত্বের কারণ।[৩৮] এ বিষয়টিতে বর্তমান যুগের সকল প্রধান মুসলিম পণ্ডিত যথা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ইমাম হাসান আল বান্না, সাইয়েদ কুতুব, মুস্তফা আল সিবায়ি, আবু জাহরা, আয়াতুল্লাহ বাকির সাদর, মুহাম্মদ আল-মুবারক, আয়াতুল্লাহ মোতাহহারি, ইউসুফ আল কারজাভির মাঝে ঐকমত্য রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা বলতে ইসলাম কী বুঝায়? এই মৌলিক চাহিদা যুগ, স্থান, কালভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। ফিকাহ পণ্ডিতগণ মানুষের মৌলিক চাহিদাকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা *(জরুরিয়াত)*, প্রশান্তিদায়ক *(হাজিয়াত)* এবং পরিশুদ্ধিকর *(তাহসিনিয়াত)*। মানুষের জীবনকে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অভাবমুক্ত ও আরামদায়ক করতে এবং মানসিক প্রশান্তি আনতে যতকিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই এই তিন *শরয়ি* শব্দের আওতাভুক্ত।[৩৯] যেসব বিলাসিতার উপকরণ যা না হলেও মানুষের কিছু আসে যায় না, সেসব

এই মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সকল ফিকাহবিদ বিলাসিতা এবং বাহুল্যকে যথাসম্ভব বর্জন করতে তাগিদ দিয়েছেন।[৪০]

যাহোক, এটিও মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম বৈরাগ্যবাদসহ দুনিয়াত্যাগী যেকোনো পন্থাকে সমর্থন করে না (আল-কুরআন, ৫৭:২৭)। মানুষ তার জীবনকে স্বচ্ছন্দ, নিরাপদ এবং আরামদায়ক করতে উপরে বর্ণিত তিন শ্রেণির চাহিদার যেকোনোটিই বৈধভাবে অর্জন ও ভোগ করতে পারে। এ বিষয়ে *শরিয়াহর* কোনো কঠোরতা নেই। মানব চাহিদার বর্ণিত তিনটি শ্রেণি বিভিন্ন মুসলিম সমাজে বা রাষ্ট্রে সেখানকার সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভেদে বিভিন্নভাবে প্রযোজ্য হবে। একই দেশে বা সমাজে সময়ের পরিবর্তনে এবং নিত্যনতুন প্রযুক্তির প্রয়োগের কারণেও এ চাহিদার ন্যূনতম সীমা পরিবর্তিত হবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম সমাজই আদিকালের মুসলিম সভ্যতাগুলোর চাইতে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেক অগ্রসর। মানুষের মৌলিক চাহিদা কোনো চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। এমনকি রাসূল সা.-এর জীবদ্দশায় যেসব ভোগ্যপণ্য ব্যবহৃত বা আবিষ্কৃত হয়নি এমন অনেক কিছুই আজকের দিনে ন্যূনতম জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত। একই মুসলিম সমাজের নিম্নবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের মাঝে এমন কোনো বিশাল আর্থিক ব্যবধান বাঞ্ছনীয় নয় যে, ধনীরা দরিদ্রদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে বা অবজ্ঞার চোখে তাকাবে। আবার নিম্নবিত্তরাও উচ্চবিত্তদের হিংসার দৃষ্টিতে দেখবে না; বরং উভয়ের মাঝে সহযোগিতামূলক ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক থাকবে। অন্যদিকে কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থার মতো সবাইকে সমান করতে যেয়ে মানুষের জীবনকে বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়েমীপূর্ণ করার মতো কোনো কঠোর ব্যবস্থা ইসলাম দেয় না। ইসলাম সহজ-সরল, সাদাসিধা জীবনধারা পছন্দ করে। একই সাথে ইসলাম মানুষের সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও রুচিশীলতাকে স্বীকৃতি দেয়।

ভিক্ষাবৃত্তি মানুষের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ পরিপন্থি। এজন্যই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে ইসলাম বর্ণিত নবম উপাদান হচ্ছে– মানুষ তার নিজের জীবিকা নিজে কাজ করেই অর্জন করবে; কখনও অন্যের কাছে হাত পাতবে না।[৪১] প্রত্যেক সক্ষম মুসলিম পুরুষের জন্য এটি *ফরজে আইন* যে, তিনি তার নিজের এবং পরিবারের ভরণপোষণের জন্য জীবিকা অন্বেষণ করবেন।[৪২] রাসূল সা. নিজেও মুসলমানদের বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা অর্জন

করতে বলেছেন, যাতে তাদের জীবিকা অন্বেষণের পথ সহজ হয়।[৪৩] মুসলিম আইনবিদগণ এই অনুসিদ্ধান্তে এসেছেন যে, হালাল জীবিকার পথ তথা যথাযথ কর্মসংস্থান ছাড়া একজন মুসলিম দুনিয়াতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।[৪৪] সেজন্যই একটি মুসলিম সমাজের বা রাষ্ট্রের ওপর *ফরজে কিফায়া আইন* এই যে, উক্ত সমাজ তার সকল নাগরিকের যোগ্যতা অনুসারে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম জীবিকা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। আধুনিক যুগে বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ মডেল দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে এবং আত্মকর্মসংস্থানে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ইসলামী *শরিয়াহ* ভিত্তিক মাইক্রো ফাইন্যান্সিংও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে। মুসলিম সরকারগুলোর উচিত এ ধরনের উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। এখানে এটিও মনে রাখা উচিত যে, প্রতিটি সমাজে এমন একটি জনগোষ্ঠী থাকবে যারা শারীরিক বা নানান প্রতিবন্ধকতা বা অসুস্থতার কারণে শ্রম দিতে বা আয় করতে অক্ষম। সেজন্য ইসলাম সমাজে এ ধরনের জনগোষ্ঠীর সম্মানজনক পুনর্বাসনের প্রকল্প চালু রাখতে তাগিদ দিয়েছে– জাকাত, *ওয়াকফ* এবং *সাদাকাহর* মাধ্যমে এসব প্রকল্পের আয় আসবে। যদি জাকাত, *সাদাকার* মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীর জন্য যথেষ্ট আয় না আসে, তবে সরকারকে আরও ভিন্ন আয়ের উৎস তৈরি করতে হবে। এমন অক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের এই দায়িত্ব পালন তাদের প্রতি কোনো কৃপা বা অনুকম্পা নয়, বরং একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা।

সমাজের অধিকাংশ অর্থ-সম্পদ যেন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে এবং তাদের মাঝেই আবর্তিত না হয়, এজন্য কুরআন বিশেষভাবে তাগিদ দেয় (আল-কুরআন, ৫৯:৭)। কুরআনের এ আদেশের আলোকে মানুষের ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে ইসলাম মতে দশম প্রয়োজনীয় উপাদানটি হচ্ছে সম্পদের সুষম ও ন্যায়সংগত বণ্টন। এটি এজন্য প্রয়োজন যে, ধনী এবং দরিদ্রে বিশাল ব্যবধান ও বৈষম্য থাকলে চরম দরিদ্র শ্রেণির পক্ষে সেই ব্যবধান অতিক্রম করা প্রায় অসাধ্য হয়ে পড়ে; তাদের মনোবল ও কর্মস্পৃহা ভেঙ্গে যায়। রাষ্ট্রের উদ্যোগে অর্থ-সম্পদ ধনীদের কাছে কেন্দ্রীভুত হওয়ার প্রবণতা রোধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এমন পদক্ষেপের অভাব মুসলিম সমাজে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে নাগরিকদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি তৈরির বদলে হিংসা-বিদ্বেষের মতো পরিস্থিতি তৈরি করবে।

এমনটি যেকোনো সমাজের স্থিতিকে ব্যাহত করবে। কাজেই ইসলাম দারিদ্র্যবিমোচনে ও আর্থিক সাম্য আনতে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রথমত, সবাইকে শ্রম দিয়ে জীবিকা অন্বেষণের তাগিদ দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রকে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে তাগিদ দিয়েছে। তৃতীয়ত, জাকাত, *সাদাকাহ*, *ওয়াকফ*, দান ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে সক্ষম শ্রেণিকে এগিয়ে আসতে বলেছে। এসবের পরও রাষ্ট্রের অতিরিক্ত দায়িত্ব হলো সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মানবোধ বজায় রাখতে *ইজতিহাদের* ভিত্তিতে সে প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এটি একটি নির্দিষ্ট আয়ের বেশি সম্পদের মানুষের জন্য অতিরিক্ত কর আরোপ করা থেকে শুরু করে সার্বিকভাবে দেশের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সবরকম *শরিয়াহ* অনুমোদিত ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ।

মানুষের ব্যক্তিত্ব উন্নয়নের একাদশতম যে উপাদান সমাজের নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জন্য অপরিহার্য, তা হলো বিয়ের মাধ্যমে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যবস্থা।[৪৫] এটি ব্যক্তির জীবনে প্রশান্তি, স্থিতি এবং নিরাপত্তা আনে এবং সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান পরিবার গঠনে সাহায্য করে। এটি শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়– সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার জন্যও অত্যাবশ্যকীয় একটি কাজ। কুরআনে বলা হয়েছে, 'এবং তাঁর নিদর্শনগুলোর মাঝে এটিও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন; যেন তোমরা তাদের কাছ থেকে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মাঝে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা-হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-গবেষণা করে' (আল-কুরআন, ৩০:২১)। বিবাহিত জীবন তখনই আল্লাহর এই উদ্দেশ্য পূরণ করে যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহর মহান ইচ্ছা পূরণে নিবেদিত এবং উত্তম চরিত্রের *(খুলুক হাসান)* হয়[৪৬] যারা শুধু নিজের বা পরস্পরের স্বার্থই চিন্তা করে না, বরং সমগ্র উম্মাহ তথা জগতের স্বার্থ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির চিন্তায় বিভোর।[৪৭] স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন দায়িত্বপূর্ণ ভালোবাসাই স্থিতিশীল সুখি পরিবার গঠন করবে– এই পরিবার হবে মানবজাতির ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্ম, লালন এবং বর্ধনের জন্য এবং সমাজ সুরক্ষার প্রাথমিক ইউনিট।

স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে বিশ্বাস, ভালোবাসা, সম্প্রীতি, সহানুভূতি তৈরি করতে কুরআন অনেকগুলো বিধান দিয়েছে। এর মাঝে আছে মানুষ এবং আল্লাহর

বান্দা হিসেবে নারীকে পুরুষের সমঅধিকার দেওয়া (আল-কুরআন, ২:২২৮); নারীর প্রতি নমনীয় ও যত্নবান হতে পুরুষকে আদেশ করা (আল-কুরআন, ৪:১৯); তাদের প্রতি দায়িত্ব আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে পালন করা (আল-কুরআন, ২:২৩৭)। কুরআনে বর্ণিত এসব দায়িত্ব এবং বিধানের কথা রাসূল সা. আরও তাগিদ সহকারে বলেছেন। তিনি নারী জাতিকে 'তোমাদের বোন' বলে সম্বোধন করেছেন।[৪৮] তাঁর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি পুরুষদের প্রতি এই আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন নারীদের সাথে ব্যবহারের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে, কারণ নারীরা তাদের কাছে আল্লাহর আমানতস্বরূপ।[৪৯] অন্য এক হাদিসে রাসূল সা. পুরুষদের সর্তক করে দিয়েছেন, তারা যেন মেয়েদের কোমলতা বা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের কোনো অধিকার হরণ না করে।[৫০] এছাড়াও তৎকালীন আরবদের চর্চা– পুত্র সন্তানকে বেশি আদর করা, আর কন্যা সন্তানের প্রতি অনীহার বিরুদ্ধেও তিনি ধিক্কার দিয়েছেন।[৫১] এই হাদিসগুলো এবং অন্য আরও অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে মেয়েদের সমমর্যাদা এবং অধিকারের কথা পরিস্ফুট হয়েছে; পরিবার এবং সমাজ গঠনে নারী এবং পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক এ-কথাও স্পষ্ট হয়েছে। নারী এবং পুরুষ পরস্পর সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিবার এবং সমাজ গঠন করবে। দ্বিতীয় খলিফা ওমর রা. (মৃত্যু ২৩ হি./ ৬৪৪ খ্রি.) বলেছেন, 'জাহিলিয়াতের (ইসলামপূর্ব যুগ) দিনগুলোতে আমরা মেয়েদের কোনো গুরুত্ব দিতাম না। ইসলামের আগমনের পর আল্লাহ স্বয়ং তাদের মর্যাদা ঘোষণা করলেন। তখন থেকে আমরা আমাদের ওপর তাদের অধিকার মেনে নিলাম।'[৫২]

বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষের চারিত্রিক পরিশুদ্ধি অর্জন, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নারী-পুরুষ ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্নেহ-মমতার বন্ধনে সন্তান প্রতিপালন এবং বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে যত্ন ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানবীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের দ্বাদশ উপাদানটি তৈরি হয়। আর এটি হচ্ছে পরিবার এবং সামাজিক সংহতি।

উপরে বর্ণিত মানবীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের বারোটি উপাদান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত এবং সমন্বিত করতে পারলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ত্রয়োদশ উপাদনটি অর্জিত হয়। তা হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অপরাধ প্রবণতা এবং হিংসা-বিদ্বেষের অবসান। যদি এই তেরোটি উপাদান যথার্থভাবে অর্জিত হয় তবে

আশা করা যায় যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের চতুর্দশ উপাদান মানসিক প্রশান্তি ও সুখ সহজেই অর্জিত হবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই সবগুলো উপাদান একসাথে বাস্তবায়িত হলে শুধু ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিসত্তা, বুদ্ধিমত্তা, বংশধারা এবং সম্পদেরই উন্নয়ন হবে না, বরং সামগ্রিকভাবে এমন এক উত্তম পরিবেশ তৈরি হবে, যা সকল মানুষ এবং সমগ্র জগতের জন্য কল্যাণকর হবে। সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের প্রসারে এটিকে অনেকদূর এগিয়ে যেতে হবে।

## *বিশ্বাস, বুদ্ধি, প্রজন্ম এবং সম্পদ সমৃদ্ধকরণ*

মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিশুদ্ধি এবং উন্নয়ন ছাড়া *শরিয়াহর* চূড়ান্ত মৌলিক লক্ষ্য 'সমগ্র মানবতার কল্যাণ সাধন' সম্ভব নয়। তেমনি *শরিয়াহর* অন্য চারটি প্রাথমিক লক্ষ্য (বিশ্বাস, বুদ্ধি, প্রজন্ম এবং সম্পদ সমৃদ্ধকরণ) অর্জনের জন্য মানুষের ব্যক্তিসত্তার উন্নয়ন ও পরিশুদ্ধি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। যদি *শরিয়াহর* এই চারটি লক্ষ্য অর্জিত না হয় তবে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের পক্ষে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে উন্নতি করা তো হবেই না, এমনকি সভ্যতারই অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

## *বিশ্বাস (দীন) শক্তিশালী করা (চিত্র ৩)*

বর্তমান সেকুলারিজম, লিবারেলিজম, আর বস্তুবাদের যুগে একজন পাঠকের মনে প্রথমেই যে প্রশ্নের উদয় হবে তা হচ্ছে– মানুষের ব্যক্তিসত্তার উন্নয়নের পরই সবার আগে ঈমানের উন্নয়নের কথা কেন আসছে? ঈমান কি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ* (*শরিয়াহর* প্রাথমিক লক্ষ্য)-এর প্রথমটিই হয়ে যাচ্ছে ঈমান? এটি একটি বাস্তবতা যে, যদি মানুষই হয় উন্নয়নের মূল লক্ষ্য এবং মাধ্যম, তাহলে সেই মানুষের পরিশুদ্ধি যেকোনো উন্নয়ন ভাবনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে এটিই স্বাভাবিক। ধর্মের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মানুষের সত্তার পরিশুদ্ধি নিশ্চিত করতে যেসব আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উপাদান আবশ্যক, তা ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এটি মূলত সম্ভব হয় মানুষের মননে মানব সৃষ্টির পেছনে কর্মরত আল্লাহর মহান লক্ষ্য, মানব জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনে প্রকৃত সফলতা ও ব্যর্থতার মানে, জীবনের মূল অর্থ বা মানে ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের মাধ্যমে এবং জীবনের সকল কর্মতৎপরতার পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (আখিরাতের সাফল্য) আরোপের মাধ্যমে। মানুষের

আচার-আচরণের পরিবর্তন, পরিশীলন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে তাদের অধিকতর মহৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, পৃথিবীর অন্য মানুষদের জন্য তাদের মাঝে কল্যাণকামী মন তৈরি করা এবং আল্লাহর প্রতি দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার অনুভূতি মনে তীব্র করার মাধ্যমে মানুষের সত্তা বা আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়। কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'সে-ই সফল হলো যে নিজের সত্তাকে (*নাফস*) পরিশুদ্ধ করলো, আল্লাহকে স্মরণ করলো এবং নামাজ পড়লো' (আল-কুরআন, ৮৭:১৪-১৫; ৯১:৯-১০)। সকল মুসলিম পণ্ডিত মানুষের সত্তার উন্নয়নের ওপর এবং এই কাজে ঈমানকে বলীয়ান করার ওপর জোর দিয়েছেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে ঐতিহাসিক টয়েনবি এবং ডুরান্টাস সঠিকভাবেই বলেছেন যে, সামাজিক সংহতি এবং সমাজের নৈতিক মানের উন্নয়ন সম্ভব নয় যদি ধর্মের নৈতিক শিক্ষা অনুসরণ না করা হয়। টয়েনবি মন্তব্য করেছেন, 'ধর্ম মানুষের মাঝে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ আরও বাড়ায়'। তিনি আরও বলেছেন, 'মানবজাতির মধ্যে যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ দেখা যায় তা এই ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ সব মানুষের প্রভু, অভিভাবক এবং পিতার মতো। নাস্তিক্যবাদী দর্শনের ভিত্তিতে যদি ধরে নেওয়া হয় যে স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই, তাহলে মানবজাতির কোনো অভিভাবক থাকলো না; এমন পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসার কোনো বন্ধন থাকার সম্ভাবনা থাকে না।'[৫৩] উইল এবং এরিয়েল ডুরান্ট তাদের বিখ্যাত গ্রন্থ *The Lessons of History*-তে লিখেছেন, 'মানবজাতির ইতিহাসে এমন কোনো সভ্যতার নজির নেই যেখানে ধর্ম ছাড়া মানুষের নৈতিকতার উত্থান ঘটেছে'।[৫৪]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সংহতি অর্জন করতে হলে ঈমান মজবুত করতে হবে কেন? নৈতিক উৎকর্ষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রধান দুটো পূর্বশর্ত আছে। প্রথমত, এমন মূলনীতি এবং আইন বহাল থাকতে হবে যা মানুষ নিঃশর্তে আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবে। দ্বিতীয়ত, ওই সমাজের সকল নাগরিকের মাঝেও ওইসব মূলনীতি মেনে চলার ব্যাপারে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা থাকবে এবং মূলনীতি ও আইন লঙ্ঘনে শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। এখন একটি প্রশ্ন উঠে, তা হচ্ছে– সমাজ বা রাষ্ট্রের সবাই আন্তরিকভাবে গ্রহণ ও পালন করবেন এমন মূলনীতি কীভাবে উদ্ভূত হবে? পাশ্চাত্যের কিছু সেকুলার দার্শনিকের মতে, 'সামাজিক ঐকমত্য' বা

'সামাজিক চুক্তির' মাধ্যমে এই ধরনের সর্বজনগ্রাহ্য, সবার জন্য পালনীয় নীতিমালা তৈরি সম্ভব। একটি দেশ বা সমাজের সকল নাগরিকের সামাজিক, আর্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা একরকম হলেই তাদের পক্ষে ঐকমত্যের নীতিমালায় উপনীত হওয়া সম্ভব। বাস্তবে এমনটি হওয়া প্রায় অসম্ভব। সমাজের ধনিক শ্রেণি তাদের আয়েশি জীবনযাত্রার উপযোগী নিয়ম-নীতি চাইবে; দরিদ্র শ্রেণি তাদের দারিদ্র্য মুক্তির উপযোগী নিয়ম চাইবে। কাজেই অবশ্যপালনীয় নীতিমালায় উপনীত হওয়ার যোগ্য সাম্যবাদী মানবসমাজ পৃথিবীতে অতীতে কোথাও ছিল না, ভবিষ্যতেও হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তাদের সুবিধামতো আইন প্রণয়ন করে সেই আইন মানতে সাধারণ মানুষকে বাধ্য করেছে; নিরীহ মানুষ তাদের ইচ্ছার বিরোধী সেসব আইন মানতে বাধ্য হয়েছে। এটি বর্তমান যুগেও হচ্ছে। এমন স্বেচ্ছাচার সব সময় বঞ্চিত শ্রেণির মাঝে হতাশা সৃষ্টি করে। এই হতাশা থেকে সৃষ্টি হয় বিদ্রোহ এবং সংঘাত। বরং সব মানুষের জন্য অনুসরণীয় মৌলনীতি এমন একজন তৈরি করুক যিনি কোনো বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, সবল-দুর্বল, ধনী-দরিদ্র এসব পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে। এমন সত্তা একমাত্র আল্লাহ। একমাত্র তাঁর দেয়া বিধানই সবার জন্য নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ এবং কল্যাণকর হবে। এখানেই মানবসত্তার উন্নয়নে আল্লাহর প্রতি শর্তহীন ঈমানের গুরুত্ব।

ইসলাম ধর্ম এই দর্শনেই বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের জন্য অবশ্যপালনীয় নীতিমালা স্বয়ং আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ সবারই স্রষ্টা, সবারই অভিভাবক। কাজেই তাঁর বিধানে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রথম মানুষ হজরত আদম এবং মা হাওয়াকে আল্লাহ স্বয়ং শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর থেকে বিশ্বের সকল জাতির জন্য আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলের মাধ্যমে তাঁর বিধান পাঠিয়েছেন। ইবরাহিম, মুসা, ঈসা এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সা. সবাই আল্লাহর বিধান নিয়ে এসেছেন। রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে আল্লাহর বিধান পূর্ণাঙ্গ আকারে সমগ্র মানবজাতির কাছে এসেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে ইসলাম এবং সকল প্রত্যাদিষ্ট ধর্মেই মানুষের সত্তার এবং বোধের উন্নয়নে নৈতিক বিধান সরাসরি স্রষ্টার কাছ থেকে তার বাণীবাহকের মাধ্যমে আসার নমুনা রয়েছে। কালের আবর্তেও মানুষের বোধ জাগ্রত করার জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক প্রেরণার আবেদন এতটুকুও ম্লান হয়নি। আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষের

দায়িত্ব আল্লাহপ্রদত্ত নৈতিক বিধান মেনে চলা। পৃথিবীতে তাদের ক্ষণিকের বসবাসকালীন সময়ে এই বিধান তাদের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত ম্যান্ডেট। তারা যদি সবাই আল্লাহর বিধান মেনে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে পৃথিবীতে তাদের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত ও রিজিক উপভোগ করে তবে তা শুধু মানুষই না, গোটা পৃথিবীর পশু-পাখি-প্রাণীকুল, তৃণ-লতা-বৃক্ষ এবং পরিবেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। সমাজবিজ্ঞানী শাডউইকের (Schadwick) পর্যবেক্ষণ এই যে, 'সামাজিক নৈতিকতা (Social morality) তৈরি হয় কিছু স্বীকৃত মানদণ্ডের বিষয়ে সর্বজনীন স্বতঃসিদ্ধ ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে'। তিনি আরও বলেন, 'সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে কখনই ধর্ম ছাড়া নৈতিকতার বিকাশ দেখা যায়নি'।[৫৫] বার্নার্ড উইলিয়াম তাই সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, 'সামাজিক নৈতিকতা দার্শনিকদের উদ্ভাবন নয়'।[৫৬]

এমনকি যেসব জাতীয় মূলনীতির বিষয়ে দেশ–জাতি জুড়ে ঐকমত্য দেখা যায়, সেগুলোও মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে পালন করেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ, অনেক আইন পালন করতে গেলে ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে হয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রশক্তির খবরদারি চলে না। কাজেই বিবেকের সক্রিয় জাগরণ ছাড়া মানুষের ওপর কোনো আইন চাপিয়ে তাকে নীতিবান করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ইসলাম বর্ণিত ঈমান মানুষকে নীতিবান করতে সতত প্রণোদনা দেয়। মানুষ ঈমানের তাগিদে শত প্রলোভনের মুখেও পৃথিবীতে আল্লাহর নির্ধারিত নৈতিক সীমা লঙ্ঘন করে না, কারণ তার সামনে পৃথিবীর জীবনের চাইতে আখেরাতের অনন্ত, অপূর্ব জীবন অমিত সম্ভাবনা নিয়ে উন্মুক্ত। আখিরাতের জীবনে শান্তি পেতে হলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি আল্লাহর দেওয়া নিয়ম পালন করেই অর্জন করতে হবে। আর মানুষের যেকোনো নৈতিক বিচ্যুতি পৃথিবীর কারো নজরে না আসলেও আল্লাহর নজরে আসবেই। এভাবেই ঈমান মানুষকে নৈতিকভাবে উন্নত করে। ঈমানের এই মহাশক্তিতেই মুসলিম সমাজ দেড় হাজার বছর ধরে নানান সংকট অতিক্রম করে, ঔপনিবেশিক আগ্রাসন মোকাবিলা করে এখনও অনেক মূল্যবোধে অবিচল রয়েছে। মানুষকে নীতিবান, আইনের শাসনের অনুসারী বানাতে ঈমানের এই মহান প্রভাবের কথাটি পাশ্চাত্যের সেকুলার অর্থনীতিবিদ আর উন্নয়নবিশারদরা কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারেন না।

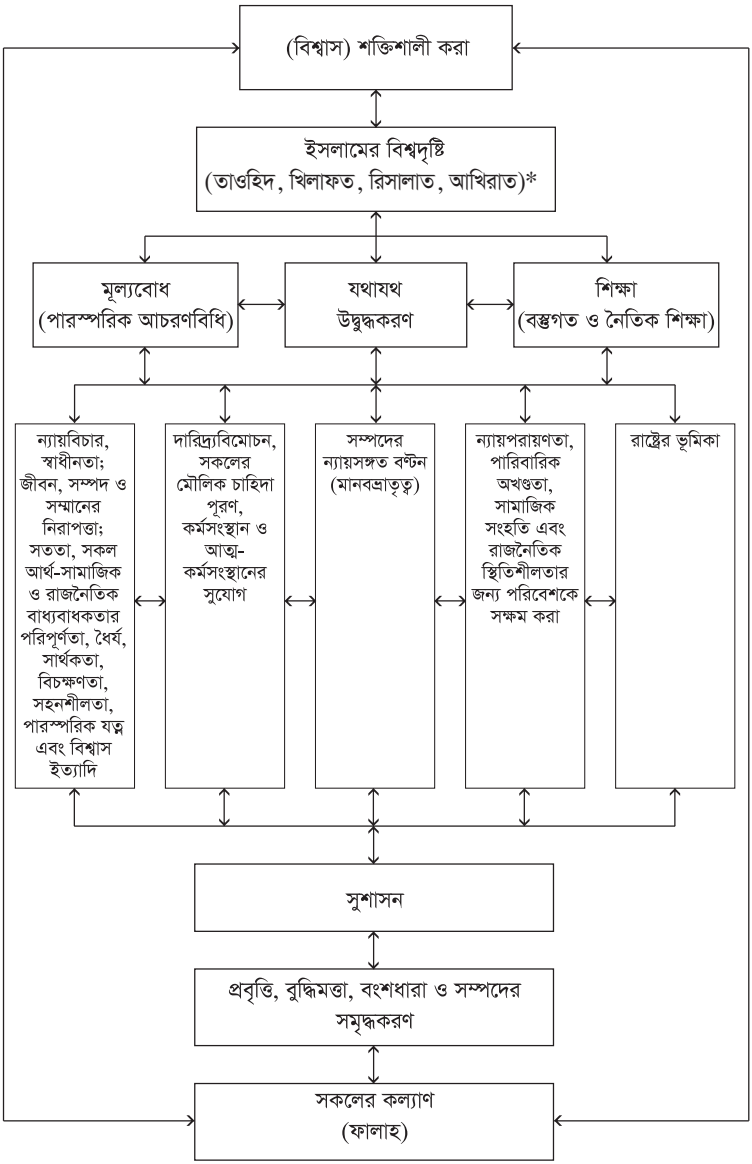


*এই শব্দগুলো স্রষ্টার একত্ব (তাওহিদ), প্রতিনিধিত্ব (খিলাফা), তাঁর রাসূলদের দ্বারা প্রেরিত নির্দেশিকা (রিসালাহ) এবং পৃথিবীতে সে কীভাবে জীবনযাপন করেছে এবং আল্লাহর দেওয়া সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করেছে সে, ব্যাপারে বিচারের দিনে স্রষ্টার সামনে মানুষের জবাবদিহিতা (আখিরাত)।

*চিত্র : ৩*

ইসলাম শুধু ঈমানের বলে বলীয়ান হতেই বলেনি, সাথে জ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ অর্জন করতে বলেছে (*আকলের* উন্নয়নে ইসলামী কর্মকৌশল পরে আলোচনা করা হবে)। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞানার্জনকে ফরজ করেছে। এখানে জ্ঞান বলতে ধর্মীয় জ্ঞান এবং পার্থিব প্রযুক্তি ও সামাজিকবিজ্ঞান সবকিছুকেই বুঝায়। এভাবে জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে মুসলিমরা একদিকে যেমন ভালো মুসলিম হবেন, অন্যদিকে তাদের সভ্যতা অপরাপর সভ্যতার চাইতে অগ্রসর থাকবে। তাদের সমাজে সবাই হবেন শিক্ষিত (অন্তত ন্যূনতম শিক্ষিত), জ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রসর। সেখানে থাকবে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের অপার সুযোগ। সেখানে প্রতিটি নাগরিক নিজের শ্রমে অর্জিত রিজিক উপভোগ করে আত্মমর্যাদার সাথে অবস্থান করবে। সেই সমাজে দারিদ্র্য থাকবে না। মানুষে-মানুষে অসাম্য, সম্পদের অসম বণ্টনজনিত হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। যদি সেই সমাজের অর্থব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির আলোকে সজ্জিত হয়, তাহলে ইসলামী কল্যাণ সমাজের সবচাইতে সুন্দর রূপটিই পরিস্ফুট হবে।[৫৭]

ইসলাম এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করতে চায় যেখানে মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৎ কর্মপন্থার দিকে চালিত হবে। পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে, সামাজিক সংহতি বাড়িয়ে, সত্যপন্থিদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা-বিনিময়-ভ্রাতৃত্ব বাড়িয়ে ইসলাম এমন এক সমাজ গড়ে, যেখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎ পথে চালিত হয়। এই ধরনের সর্বব্যাপী ব্যবস্থা ছাড়া যেকোনো উত্তম মূলনীতি অকার্যকর হিতোপদেশে পরিণত হয়। ইসলামের এসব ব্যবস্থার মাঝে আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জামায়াতে নামাজ, রমজানের রোজা, জাকাত, হজ, সমাজে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুধারণা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা *(আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার)* ইত্যাদি।

এ ধরনের সর্বব্যাপী নৈতিক উত্থানের কর্মসূচি এবং পরিবেশ ব্যক্তি পর্যায়ে চূড়ান্ত নৈতিক পরিশুদ্ধি আনে; যেসব অসৎচর্চা মানুষের জীবনকে ভ্রষ্ট করে সেসবের চর্চা বন্ধ করে মানুষকে কল্যাণমুখী লক্ষ্যে চালিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইসলাম তার অনুসারীদের সহজ-সরল জীবনযাপন করতে বলে। তাদের এই সরল জীবনধারা অনুসরণ এবং চোখধাঁধানো অপচয়ী জীবন বর্জনের কারণে পৃথিবীর সম্পদ কম খরচ হবে। এতে মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যথেষ্ট সম্পদ হেফাজত থাকবে। ভোগবাদী জীবনধারার চাহিদা

মেটানোর জন্য যেভাবে পৃথিবীর খনিজ সম্পদ আহরিত হচ্ছে তা নিয়ে বর্তমানে অনেক বিজ্ঞানী ও পরিবেশবাদী আধুনিক মানুষ শঙ্কিত; হয়তো আগামী কয়েক দশক পরই বিশ্ব জ্বালানীশূন্য হয়ে পড়বে। ইসলামের শিক্ষা ও পরিমিত জীবনধারাই বর্তমান প্রজন্মের মানুষকে এমন সংযমী, সংযত আচরণে চালিত করবে যে, তারা পৃথিবীর সকল সম্পদকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিশ্চিত রেখে নিজেদের হকটুকু ব্যবহার করবে। এই মিতচারী জীবনধারা শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীর সম্পদের মওজুদই রাখবে না, বরং বর্তমান প্রজন্মের জন্যও উদ্বৃত্ত সম্পদ, কর্মসংস্থান, জরুরি তহবিল ইত্যাদি নিশ্চিত করবে। এতক্ষণ আমরা মানুষের ব্যক্তিগত মিতাচারী ও নৈতিক আচরণ কীভাবে সার্বিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করলাম। বস্তুত, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের অর্থনৈতিক আচরণ বা মাইক্রো ইকোনমিকসের আলোচনায় যদি ব্যক্তির নৈতিক আচরণকে অন্তর্ভুক্ত না করা হয় তবে ম্যাক্রো ইকোনমিকস বা সার্বিক অর্থনীতির ওপর ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ম্যাক্রো ইকোনমিকসের মানবিক আবেদনগুলো মানুষের বল্গাহীন ভোগবাদী চর্চায় ভেসে যাবে।

সতেরো এবং আঠারো শতকের 'আলোকিত আন্দোলন' তার ধর্মনিরপেক্ষ এবং বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করেছিল। এই কাজে তারা আংশিক সফলও হয়। কারণ শিল্পবিপ্লবের পূর্বে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে চার্চ ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিল। ফলে বিজ্ঞানের উত্থানে তাদের প্রভাব ম্লান হতে থাকে। পরবর্তী দুই শতকব্যাপী বল্গাহীন বস্তুবাদ ও ভোগবাদের চর্চা এবং নৈতিকতার অধঃপতনে আজ ইউরোপীয় মানুষ আবারো ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে।[৫৮] নোবেল জয়ী শুয়িৎজার (Schweitzer) সঠিকভাবেই বলেছেন, একটি সভ্যতার নৈতিক ভিত্তি ধসে পড়লে গোটা সভ্যতায় ধস নামে, এমনকি বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে উন্নতিও নৈতিক ধসের ক্ষয়রোধ করতে পারে না।[৫৯] তিনি তাই গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 'মানুষের নৈতিকতার উন্নয়ন এবং নৈতিক সংযম অর্জন করতে পারার গুরুত্ব তার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার শক্তি-সামর্থ্যের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'[৬০] অতি সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেঞ্জামিন ফ্রিডম্যান বলেছেন, নৈতিক উন্নতি এবং অর্থনৈতিক উন্নতি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে একসাথে অগ্রসর হয় এবং একটি

আরেকটিকে শক্তিশালী করে।[৬১] আধুনিক এই মনীষীদের শত শত বছর আগে আল-গাজ্জালি, আল-শাতিবির মতো ইসলামী পণ্ডিতগণ মানুষের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে নৈতিক উন্নয়ন এবং নৈতিক উন্নয়নের মূলভিত্তি হিসেবে ঈমান মজবুতকরণের বিষয়ে জোর দিয়ে বলেছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উন্নয়নের শুরুতেই যদি মানুষের ঈমানের উন্নয়নের কথা বলা হয়, তাহলে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা হয় কি না? ঈমান মানে আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ। অবশ্য এই আত্মসমর্পণের মাঝেও বান্দার এই স্বাধীনতা আছে যে, আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মাঝে সব সুযোগ তার জন্য উন্মুক্ত। কুরআনে বলা হয়েছে, 'এই মহাসত্য এসেছে তোমার প্রভুর কাছ থেকে। এখন যার ইচ্ছা এটি মেনে নেবে, যার ইচ্ছা এটি অস্বীকার করবে' (আল-কুরআন, ১৮:২৯)। পাশ্চাত্য সমাজেও মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার অনেককিছু বৃহত্তর স্বার্থে (Totalitarian) বিসর্জন দিতে হয়। যেমন– ট্রাফিক সিগন্যালে লালবাতি জ্বলে উঠলে সকল চালককে তাদের যানবাহন থামাতে হয়। এটি আমরা সহজে বুঝি এবং মেনে চলি, কেননা এই সিগন্যাল অমান্য করলে নিজের বা অন্যদের দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়বে। কাজেই আল্লাহর ওপর ঈমান দৃঢ় করার প্রচেষ্টা মানে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হওয়া নয়, বরং ব্যক্তি এবং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত হওয়া।

### *রাষ্ট্রের ভূমিকা*

আমরা মানুষের নৈতিকতার উন্নয়নে ঈমান মজবুত করার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেছি। তাই বলে এটি ভাবা ঠিক হবে না যে, শুধু ঈমান মজবুত করেই মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণ অর্জন সম্ভব। এটি অবাস্তব যে, একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সকল নাগরিক শুধু আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয়ে একশতভাগ নৈতিক মানসম্পন্ন হয়ে যাবে। এছাড়াও শুধু নৈতিক হলেই চলবে না, একজন মানুষকে সামাজিক কাজ-কর্মের অগ্রাধিকারগুলোও বুঝতে সক্ষম হতে হবে। রাসূল সা. স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করেন তার চেয়ে বেশি সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেন'।[৬২] কুরআন মানুষকে জীবন চালনার মূলনীতি দেয়, কিন্তু সেই মূলনীতিতে চলতে বাধ্য করে না। রাষ্ট্রের এটি দায়িত্ব যে, তার আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মানুষ নৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক আচরণ

করছে কিনা তা দেখা এবং নিশ্চিত করা; রাষ্ট্রের সর্বত্র আইনের শাসন, ইনসাফ ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। রাসূল মুহাম্মদ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাষ্ট্র বা জনগণের দায়িত্বে নিয়োজিত হলো অথচ সে দায়িত্বে অবহেলা করলো, তবে সে বেহেশতের ধারেকাছেও যেতে পারবে না।'[৬৩] তাঁর এই হাদিসের প্রতিধ্বনি সমকালীন অনেক মুসলিম পণ্ডিতের লেখায় দেখা যায়। যেমন ইমাম হাসান আল-বান্না বলেছেন, 'সকল আর্থ-সামাজিক সংস্কারের মূল এবং হৃৎপিণ্ড হচ্ছে সরকার। যদি সরকার বা প্রশাসন দুর্নীতিবাজ হয়, তবে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীন সব প্রতিষ্ঠানকেই দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করবে; আর যদি সরকারকে দুর্নীতিমুক্ত করা যায়, তবে রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি দূর হবে।'[৬৪]

তবে মনে রাখতে হবে যে, সরকার মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে সম্পূর্ণ ভালো অর্থে এবং যথাসম্ভব ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে। অপ্রয়োজনে মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও ব্যাপক রাষ্ট্রীয়করণ মানুষের স্ব-উদ্যোগ এবং নতুন কিছু আবিষ্কারের মেধা-মননকে ধ্বংস করে। সেজন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত যেকোনো নিয়মকানুন যথাসম্ভব জনগণ ও পেশাজীবীদের মতামত নিয়ে চালু করা উচিত। একটি ভালো রাষ্ট্রে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সংসদ, সৎ এবং সাহসী বিচার বিভাগ, স্বাধীন মিডিয়া এবং উপযুক্ত আইনকানুন– সবকিছু সুসমন্বিত থাকে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এসব প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য সব ধরনের সহযোগিতা ও প্রণোদনা দেওয়া। তাহলেই রাষ্ট্রের এসব সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং মতামতের ভিত্তিতে জনগণের নৈতিক এবং মানবিক মানোন্নয়ন হবে। অবশ্য রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব ব্যক্তির সৎ থাকার বিষয়ে নিজের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, সংকল্পবোধ এবং উদ্যোগকে কোনোভাবেই খাটো করে না, বরং ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধিই রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়মনীতি বহাল রাখতে সহায়তা করে।

মানুষ তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার নিজের জীবনে, তার পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ে ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়নে যত আন্তরিক ও সচেষ্ট হবে, ততই এসব বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কমবে। অন্যদিকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যত বেশি জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে, যত বেশি মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, সংসদ যত প্রাণবন্ত এবং সক্রিয় থাকবে, আদালত এবং বিচার বিভাগ যত সাহসী, সৎ এবং স্বাধীন থাকবে, ততই সমাজ থেকে অবিচার, দুর্নীতি, অসাম্য দূর হয়ে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হবে। এমনকি যদি অমুসলিম রাষ্ট্রের

অনুসরণযোগ্য উত্তম কোনো নিয়মকানুন দেখা যায়, তবে *ইজতিহাদের* ভিত্তিতে তা মুসলিম রাষ্ট্রে কার্যকর করা যেতে পারে।

### *বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধকরণ (আকল) (চিত্র ৪)*

মানুষের *আকল* বা বিবেক-বুদ্ধি বা বুদ্ধিমত্তা মানুষের একটি অনুপম গুণ। এই গুণ থাকার মাধ্যমে মানুষ অন্য সব প্রাণীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে। মানুষের নিজের জন্য, তার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য তার নিজের *আকলের* উন্নয়ন অপরিহার্য। এটি এমন এক প্রক্রিয়া যা তার জীবনভর অব্যাহত রাখতে হবে। এটির উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষ নিত্যনতুন প্রযুক্তি এবং মূল্যবোধ বিনির্মাণ করতে পারবে। ইমাম গাজ্জালির মতে, '*আকল* হচ্ছে জ্ঞানের ঝর্ণাধারার উৎসমুখ, সকল জ্ঞানের আদি ভিত্তি। এটি থেকে জ্ঞানী সৃষ্টি হয় এমনভাবে, যেমন গাছ থেকে ফল হয়, সূর্য থেকে আলো উৎপন্ন হয়, চোখ দিয়ে দেখা যায়। এটি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, এই *আকলের* সর্বোত্তম ব্যবহারই হতে পারে পৃথিবীর জীবনকে সফল করে আখেরাতের জীবনে মুক্তি অর্জনের প্রধান মাধ্যম।'[৬৫] যদিও আমরা *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্য অর্জনের প্রথম ধাপ হিসেবে ঈমানের মজবুতীকরণের ওপর জোর দিয়েছি, তবু এর মানে এটি নয় যে *আকলের* উন্নয়নের গুরুত্ব কম। এই ধারাক্রম ব্যবহারের কারণ এটি যে– প্রথমত, মানুষকে ওহিপ্রাপ্ত জ্ঞানের ওপর দ্বিধাহীন, শর্তহীন ঈমান আনতে হবে; অতঃপর প্রতিটি বিষয়ে ঈমানভিত্তিক বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কাজেই ওহি এবং যুক্তি এই দুইয়ের সমন্বয়েই মানবসত্তার উন্নয়ন ও কল্যাণ।

ঈমান মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তিকে সঠিক পন্থায়, সঠিক পথে চালিত করে। ঈমানের নির্দেশনা ছাড়া মানুষ তার বুদ্ধিমত্তাকে বিকশিত করতে গেলে তার দ্বারা ভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। মানব সভ্যতাধ্বংসী মারণাস্ত্র এবং মতবাদ তৈরি হতে পারে। মানুষ তার জ্ঞানকে অন্যদের প্রতারিত করার কাজে ব্যবহার করতে পারে। কাজেই ঈমানবিহীন জ্ঞানচর্চা বিপদজনক। ঈমান এবং বুদ্ধিমত্তা একটি আরেকটির পরিপূরক। বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান যেমন সঠিক পথে চালিত হতে হলে ঈমানের নির্দেশনা প্রযোজন, তেমনি মানুষের কল্যাণ সাধনে ঈমানের লক্ষ্য অর্জনে মানুষের *আকল* বা বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার প্রয়োজন। মানুষের এবং সমাজের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং নিত্য-নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে *আকলের* সার্বক্ষণিক প্রয়োগ অপরিহার্য। সীমিত সম্পদের

মধ্যে মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধনে, সীমিত জায়গায় বিশাল জনগোষ্ঠীর রিজিক বা কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে ঈমানের নির্দেশনায় *আকল*-উদ্ভূত প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। এটি *মাকাসিদের* বাস্তবায়নে অনেক সহায়ক। কাজেই ঈমান এবং *আকল* কোনোটিকেই কম মনে করা যাবে না; *শরিয়াহর* লক্ষ্য অর্জনে উভয়টিতেই সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। কুরআনও এ বিষয়ে তাগিদ দিয়েছে (আল-কুরআন, ৩:১৯০-১৯১; ৪১:৫৩)।

ইসলামের ইতিহাস জুড়ে অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতের লেখায় *আকলের* উন্নয়নের গুরুত্ব উঠে এসেছে। যেমন– ইবন তাইমিয়া স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'কুরআন, সুন্নাহর অনুধাবন ও *ইজমার* মাধ্যমে মুসলিমরা যে মূলনীতি এবং জ্ঞান অর্জন করবে, তা যেন অবশ্যই বিবেকসম্মত এবং যুক্তিভিত্তিক হয়; কারণ যেসব মূলনীতি স্পষ্টভাবে বিবেকবুদ্ধি বিরোধী, তা অবশ্যই বাতিল।'[৬৬] তিনি আরও বলেছেন যে, তার এই কথার মানে এটি নয় যে, কুরআন-হাদিস থেকে জনগণ ভুল বা অযৌক্তিক শিক্ষা নিলে তার দায় কুরআন-হাদিসের ওপর পড়বে; বরং যারা কুরআন-হাদিস সঠিকভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হবেন, তারাই ব্যর্থ।[৬৭] বিশ শতকের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মুস্তাফা আল-জারকা (বাদশাহ ফয়সল পদকপ্রাপ্ত) সোজাসুজি বলেছেন, 'এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে স্পষ্ট মতৈক্য রয়েছে যে, ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে বিবেকবুদ্ধি এবং যুক্তির কোনো বিরোধ নেই।'[৬৮]

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ঈমান এবং *আকল* (বুদ্ধিমত্তা বা যুক্তি) একে অপরের পরিপূরক; একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে *মাকাসিদের* বাস্তবায়নে সহায়তা করে। *আকলের* যথাযথ ব্যবহার না করে প্রয়োজনীয় ইজতিহাদ করা যাবে না এবং *আকল* না খাটিয়ে কুরআন-হাদিসও সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত *আকল* ছাড়া কারো পক্ষে কোনো ফতোয়া বা কোনো বিষয়ে *শরিয়াহর* আলোকে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। যুক্তি-বিবেচনা বা বিবেকবুদ্ধিবর্জিত কোনো ফতোয়া *মাকাসিদ* বা *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্য অর্জনের বদলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে; মানুষের কল্যাণ করার বদলে তাকে কষ্ট দিতে পারে। কখনও এমন কিছু চোখে পড়লেই মুসলিম পণ্ডিতদের উচিত সংশ্লিষ্ট ভ্রান্ত ফতোয়া সংশোধন বা বাতিল করা– বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত *শরিয়াহ* বিশেষজ্ঞ এমন মন্তব্য করেছেন। যেমন– ইমাম আল-হারামাইন আবু আল-মানি আল-জুয়াইনি (মৃত্যু ৪৭৮ হি./ ১০৮৫ খ্রি.) বলেছেন, '*শরিয়াহর* ভিত্তিতে কোনো বিষয়কে গ্রহণযোগ্য বা বর্জনীয় ঘোষণার

সময় *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্য *(মাকাসিদ)* থেকে যারা সরে যান, তাদের দূরদৃষ্টির অভাব রয়েছে। এমন অদূরদর্শীতা নিয়ে কোনো বিধান জারি করা অনুচিত।'[৬৯] শায়খ মুহাম্মদ আল-তাহির ইবন আশুর বলেছেন, '*উসুল আল-ফিকহ* (ইসলামী আইনবিদ্যা)-এর বড় সংখ্যক ইস্যু সমাধান করতে গিয়ে আইনবিদরা *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্য জগতের কল্যাণের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের মতামত ও পছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন।[৭০] এমন ধারার একপেশে আলেমদের কারণে *উসুল আল-ফিকহ* ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে যে দারুণ দিকনির্দেশনা দিয়ে উম্মাহকে কল্যাণ ও উন্নয়নের দিকে চালিত করতো, সেই মহান লক্ষ্য থেকে সরে গিয়েছে। ধর্মভিত্তিক জ্ঞানের রেনেসাঁর জন্য এটিকে আবার আগের মতো গতিশীল করতে হবে।[৭১]

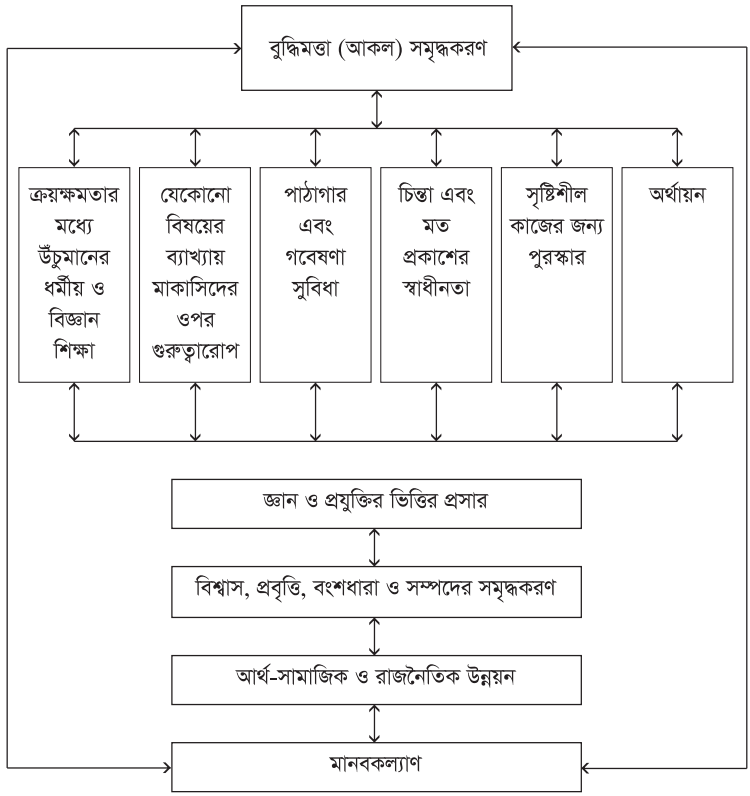


*চিত্র : ৪*

*মাকাসিদের* মূল লক্ষ্যের দিকে গুরুত্ব দিয়ে এটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে শুধু ইসলামী জ্ঞানেরই অগ্রগতি হবে না, বরং উম্মাহর মধ্যে বিরাজমান মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, অসহিষ্ণুতা ও বাড়াবাড়ি দূর হবে। ঈমানের সাথে *আকলের* (যুক্তি) সমন্বয়ে এবং ওহির সাথে যুক্তির সমন্বয়ে ইসলামী আইনবিদ্যা পুনর্গঠনে মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। আগামী প্রজন্মের মুসলিমদের এমনভাবে শিক্ষিত করতে হবে, যেন তারা একই সাথে *শরিয়াহ* এবং আধুনিক বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে সমান পারদর্শী হয়। তারা যেন নতুন যেকোনো কিছু গ্রহণ, বর্জন বা অভিযোজন করতে ওহি এবং যুক্তির সমন্বয়ে নিজেদের জন্য নির্দেশনা বের করে আনার যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। এমনটি হলে খুব শীঘ্রই ইসলামের সোনালি অতীত ফিরিয়ে আনা যাবে।

এটি সহজেই বোধগম্য যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ধর্ম যা সমগ্র মানবজাতির আর্থ-সামাজিক উত্থান প্রত্যাশা করে। কাজেই সেই ধর্ম মানবজাতির শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করবে। এটিও কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর কাছে আল্লাহর প্রথম ওহি হচ্ছে 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে ... যিনি শিখিয়েছেন কলমের সাহায্যে। তাকে শিখিয়েছেন এমন জ্ঞান যা সে জানত না' (আল-কুরআন, ৯৬:১-৫)। রাসূল মুহাম্মদ সা. প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করেছেন। এছাড়াও তিনি বলেছেন, 'একজন ইবাদতকারী ব্যক্তির তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, তারকাদের ওপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো।'[৭২] ধর্মীয় এবং জাগতিক– বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুষম সমন্বয়েই একটি জনগোষ্ঠীকে নৈতিক মূল্যবোধ এবং নিজেদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে পারদর্শী ও দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা যায়। এমন জ্ঞানী এবং নীতিবান জনগোষ্ঠীর মাধ্যমেই *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়। কুরআন এবং সুন্নাহয় যেভাবে জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি *ফিকাহ* পণ্ডিতরাও একই তাগিদ দিয়েছেন। বিশ শতকের খ্যাতিমান মুসলিম মনীষী আবু জাহরাহ বলেছেন, 'প্রতিটি নাগরিককে এমনভাবে শিক্ষিত ও দক্ষ করতে হবে, যাতে সে সমাজের জন্য উপকারের উৎস হয়, সমাজের জন্য ক্ষতিকর বোঝা না হয়।'[৭৩]

অবশ্য মানব সমাজের নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা হতে হবে নিখুঁত, নির্ভুল এবং সর্বোচ্চ মানের। এই মহান উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক পাঠদান উপকরণ, লাইব্রেরি,

ল্যাবরেটরি, যোগাযোগ প্রযুক্তি, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি না থাকে। যদি মানুষ তার চিন্তা, গবেষণা ও সৃষ্টিশীল কাজের বিনিময়ে উপযুক্ত সম্মান ও সম্মাননা না পায়, যোগ্য পদ ও দায়িত্ব না পায়, যথাসময়ে প্রাপ্য যথাযথ পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়– তবে সেই মানুষেরা তাদের কাজের স্পৃহা হারিয়ে ফেলবে। যে রাষ্ট্রে বা সমাজে চাকরিতে অন্তর্ভুক্তি, পদন্নোতি, বদলি ইত্যাদি মেধা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে না হয়ে দলীয়, পারিবারিক, অঞ্চলভিত্তিক পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে হয়, সেই রাষ্ট্রের উন্নয়নভাবনা এক অলীক কল্পনা।

উঁচু মানের শিক্ষা নিশ্চিত করার অন্যতম অন্তরায় দারিদ্র্য। আবার অশিক্ষার কারণে দারিদ্র্য বাড়ে। দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা একটি দুষ্টচক্র। এই চক্র ভাঙ্গতে হলে রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রে সম্পদের অপচয়, লুটপাট বন্ধ হলে শিক্ষা, গবেষণার মতো কাজে যথেষ্ট সম্পদের সংস্থান করা যাবে।

### *ভবিষ্যৎ বংশধারার সমৃদ্ধকরণ (নাসল) (চিত্র ৫)*

কোনো সভ্যতাই টিকে থাকতে পারে না যদি তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আধ্যাত্মিক, দৈহিক এবং মানসিক যোগ্যতায় আগের প্রজন্মের চাইতে নিম্নমানের হয়। সেক্ষেত্রে তারা নতুন যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়; নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার দক্ষতা তাদের থাকে না। কাজেই সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞান, প্রযুক্তিসহ সব বিষয়ে উন্নতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। জ্ঞানের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো একটি শিশুকে যেভাবে, যে পরিবেশে লালনপালন করা হয় তা। মুসলমান পিতা-মাতার উচিত তাদের সন্তানদের এমনভাবে বড় করা, যাতে তারা মহৎ মানুষে *(খুলুক হাসান)* পরিণত হয়। তাদের মধ্যে ইসলামবর্ণিত সব গুণ বিকশিত করা উচিত। শৈশব থেকেই তাদের সৎ, সত্যবাদী, বিবেকবান, সহনশীল, নিয়মানুবর্তী, কঠোর পরিশ্রমী, মিতাচারী, ভদ্র, পিতা-মাতা-শিক্ষক-বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালনে আগ্রহী, বিশেষভাবে অধীনস্তদের অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়ে সচেতন, দরিদ্র এবং অনগ্রসর মানুষের প্রতি সাহায্যকারী, সবার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সমর্থ করে বড় করা উচিত।

পরিবার হচ্ছে মানব সন্তানের নৈতিক শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান। যদি এই প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মহৎ মানুষ *(খুলুক হাসান)* হওয়ার প্রেরণা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে এই শিশুর পরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষেও তার মাঝে নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটানো কঠিন হয়ে যাবে। পুরো সমাজের বিপর্যয় শুরু হবে যদি পারিবারিক বন্ধন এবং পরিবেশ শিথিল হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক শিক্ষা দিতে পরিবার ব্যর্থ হতে পারে যদি ওই পরিবারের বাবা-মায়ের মধ্যে পর্যাপ্ত ইসলামী নৈতিক গুণাবলি না থাকে। এক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে সন্তানের কাছে *খুলুক হাসানের* রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হবেন। ভবিষ্যত প্রজন্মকে নীতিবান মানুষ বানাবার স্বার্থে বাবা-মাকে নীতিবান হতে হবে। এ-ছাড়াও তাদের পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আকর্ষণ এবং প্রশান্তির পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে (আল-কুরআন, ৩৯:২১)। এমন পরিবেশ তখনই নিশ্চিত হবে যখন বাবা-মা উভয়ে পরিবারে তাদের দায়িত্ব আন্তরিকতা এবং সুবিবেচনার সাথে পালন করবেন; পরস্পরকে সহযোগিতা করবেন। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার মাঝে সার্বক্ষণিক কলহ এক ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। স্বামী-স্ত্রীর কলহ অনেক সময় বিয়ে-বিচ্ছেদে রূপ নেয় যা সন্তানের মানসিক, নৈতিক উন্নয়নের জন্য ভয়ানক বাধা হয়ে দেখা দেয়।[৭৪] এজন্যই রাসূল মুহাম্মদ সা. বলেছেন, 'আল্লাহ অনুমোদিত সব কাজের মধ্যে সবচাইতে অপছন্দনীয় কাজ হচ্ছে তালাক'।[৭৫] তিনি আরও বলেছেন, 'বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিও না, কারণ তালাক আল্লাহর আরশকে কাঁপিয়ে তোলে'।[৭৬] কাজেই সন্তান তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার স্বার্থে স্বামী-স্ত্রীর কলহ-বিবাদ এবং তালাক এড়ানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত।

পারিবারিক বন্ধন রক্ষা এবং পরিবারে নৈতিক পরিবেশ বজায় রাখার পর মানব সন্তানের উৎকর্ষের জন্য পরবর্তী যে বিষয়টি জরুরি তা হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। শিক্ষা অর্জন করে তারা পুরো দেশের আর্থ-সামাজিক, নৈতিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অর্জনে অবদান রাখতে পারে। শিক্ষা অর্জনের জন্য উন্নতমানের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সকল বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম দেশগুলোতেই ছিল। উম্মাহর অধঃপতন আর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার হয়ে গত কয়েক শতক ধরে এই দিকটিতে

মুসলিম বিশ্ব বেশ পিছিয়ে পড়েছিল। কাজেই বর্তমান এবং আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা প্রসারে এবং উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সে জন্যই আজ অনেক দেশের দেয়াল লিখনে দেখা যায়, 'শিক্ষা' এবং 'শিক্ষা'। আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা যদি একটি পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে বা মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিশ্চিত করা না যায়, তবে জাতির বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে– সেটি এক ভয়াবহ অবস্থা। ভালো মানের উচ্চ শিক্ষা শুধু ধনী এলিট শ্রেণির সন্তানদের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়বে।

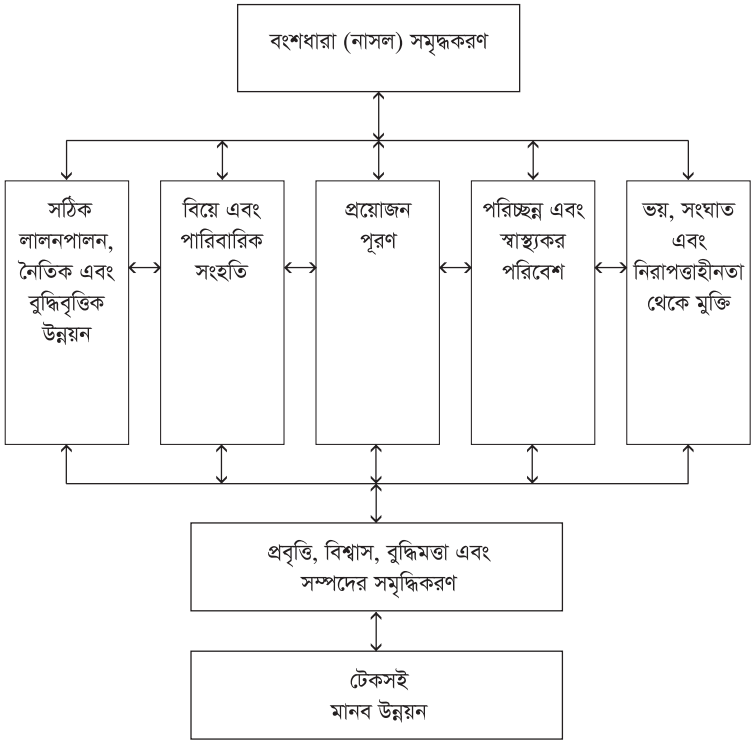


*চিত্র : ৫*

সমাজে বিরাজমান ধনী-দরিদ্রের অসাম্য আরও বাড়বে; সমাজে বিদ্যমান হিংসা-বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা-অস্থিতিশীলতা আরো তীব্র হবে। শিক্ষাকে সুলভ বা বিনামূল্যে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনরা প্রায়ই দেশের সম্পদের ঘাটতি থাকার যুক্তি দেখান। বস্তুত এটি একটি খোঁড়া যুক্তি। সরকারযন্ত্রের

মাথাভারী প্রশাসন, বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি, অপচয়, অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর হলে শিক্ষার জন্য কোনো দেশেই অর্থ সংকট আছে বলে মনে হয় না।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নের জন্য আরো দুটো বিষয় অত্যাবশ্যকীয়। এর একটি হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় সব চাহিদা, বিশেষভাবে সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ নিশ্চিত করা। সুন্দর দেহ ও সুন্দর মন নিয়ে তারা সমাজের উন্নয়নে সফলভাবে অংশ নিতে পারবে। রাসূল সা. বলেছেন, 'একজন স্বাস্থ্যবান মুসলিম আল্লাহর কাছে দুর্বল শরীরের ব্যক্তির চাইতে বেশি পছন্দনীয়'।[৭৭] যদি শিশুরা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার, পরিচ্ছন্ন আবাস ও পোশাক, ভালো মানের চিকিৎসাসেবা না পায়, তবে তাদের পক্ষে সুস্থ, সবল, সক্ষম জনশক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। আর দুর্বল জনগোষ্ঠীর পক্ষে যথাযথ শিক্ষা নিয়ে জাতির উন্নয়নে অবদান রাখা সম্ভব নয়।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নের জন্য আর যে বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার তা হচ্ছে, তারা যেন ভয়-ভীতি-শঙ্কা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নিরাপত্তাহীনতাবোধ, হীনমন্যতা ইত্যাদি থেকে মুক্তভাবে বড় হতে পারে। তাদের ওপর পূর্বপুরুষের ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়াও তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বড় বাধা। রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য সম্পদের বণ্টনব্যবস্থা এমন ইনসাফপূর্ণ হতে হবে যাতে সবার কাছে ন্যূনতম চাহিদা পূরণের মতো অর্থ থাকে। এমনটি হলে সমাজে কারো মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি কাজ করবে না; হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি থাকবে না। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋণমুক্ত করতে রাষ্ট্র কিছু উদ্যোগ নিতে পারে। প্রথমত, এমন প্রচারণা ও উৎসাহ প্রদান করা যাতে মানুষ মিতব্যয়ী, মিতচারী জীবনধারা বেছে নেয়; যাতে করে তাদের জীবনের চাহিদা অল্প থাকে। এতে তাদের ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। এটি শুধু ব্যক্তি পর্যায়ের ঋণগ্রস্ততাকেই কমাবে না, বরং সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রের পুঁজি বৃদ্ধি করে শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। এছাড়াও সরকারের নিজস্ব ব্যয় সংকোচন করতে হবে। প্রায়ই মাথাভারী প্রশাসনযন্ত্রের মাত্রাতিরিক্ত অপচয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপর করের বোঝা বাড়ায়; বাড়তি কর মানুষকে দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত করে। এভাবে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়ের সম্পদ সাশ্রয় করা গেলে *মাকাসিদের* বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ব্যয় বরাদ্দ করা সম্ভব।

## *সম্পদের উন্নয়ন ও পরিবর্ধন (চিত্র ৬)*

*মাকাসিদ আল-শরিয়াহ'র* প্রধান পাঁচটি লক্ষ্য বর্ণনার সময় ইমাম গাজ্জালি এবং আল-শাতিবি দুজনেই 'সম্পদের সুরক্ষাকে' *(হিফদ আল-মাল)* পঞ্চম এবং সর্বশেষ স্থানে রেখেছেন। তাই বলে এটি মনে করা ঠিক হবে না যে, সম্পদের প্রসার ও সুরক্ষার বিষয়টিকে ইসলামে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ *শরিয়াহর* বাকি সব লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য সম্পদ অর্জন এবং তার সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। বৈরাগ্যবাদ ও দুনিয়াত্যাগী দর্শন কুরআন এবং সুন্নাহ সমর্থন করে না। কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর যে বৈরাগ্যবাদ তারা আবিষ্কার করেছে, আমরা তাদের জন্য তা নির্ধারণ করিনি' (আল-কুরআন, ৫৭:২৭)। এজন্যই রাসূল মুহাম্মদ সা. বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তির সম্পদ অর্জনে ক্ষতি নেই যদি তার অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে'।[৭৮] তিনি আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে'।[৭৯] একজন বিশিষ্ট আইনবিদ ও কুরআনের ভাষ্যকার ইমাম ফখরুদ্দিন আল-রাজি *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্যসমূহ বর্ণনার সময় *হিফদ আল-মালকে হিফদ আল-নাফসের* পরই স্থান দিয়েছেন।[৮০]

সম্পদ হচ্ছে মানুষের কাছে আল্লাহপ্রদত্ত আমানত এবং আল্লাহপ্রদত্ত এই সম্পদ মানুষ আল্লাহ-প্রদর্শিত পথে সৎভাবে, বিবেক বিবেচনার সাথে নিজের এবং পরিবারের ভরণপোষণে, সম্মানজনক জীবনযাপনে, প্রতিবেশি দরিদ্র বা মিসকিন ব্যক্তিদের নৈমিত্তিক চাহিদাপূরণে, সমাজের দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করবে। মুসলমিদের সম্পদ অর্জন এবং ব্যয় দুটোই *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ'র* বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই হবে। সম্পদ হচ্ছে মুসলমানদের জন্য এমন বিষয় যেটি অর্জন এবং ব্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ঈমানি চেতনার ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। ঈমানি মূল্যবোধবর্জিত মানুষের জন্য অঢেল সম্পদ তার বল্গাহীন অনৈতিক চর্চার হাতিয়ারে পরিণত হবে। এই ধরনের সম্পদশালী ব্যক্তির মন্দ আচরণ তার সমাজ, সভ্যতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ক্ষতি ডেকে আনবে। রাসূল মুহাম্মদ সা. বলেছেন, 'দিনার, দিরহাম ও মখমলের গোলাম নিকৃষ্ট'।[৮১] কাজেই ঈমান এবং সম্পদ দুটো একসাথে মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি চলে না। মানুষের আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন, তার বান্দার হক আদায়, নিজের ভরণপোষণ, দরিদ্র প্রতিবেশির দেখভাল করা সবকিছুর জন্যই সম্পদ

প্রয়োজন। আবার এই সম্পদকে সত্যিকার মানবকল্যাণে নিয়োজিত করতে ব্যক্তির ঈমান থাকা চাই। অন্যথায় সম্পদ আপদে পরিণত হবে।[৮২]

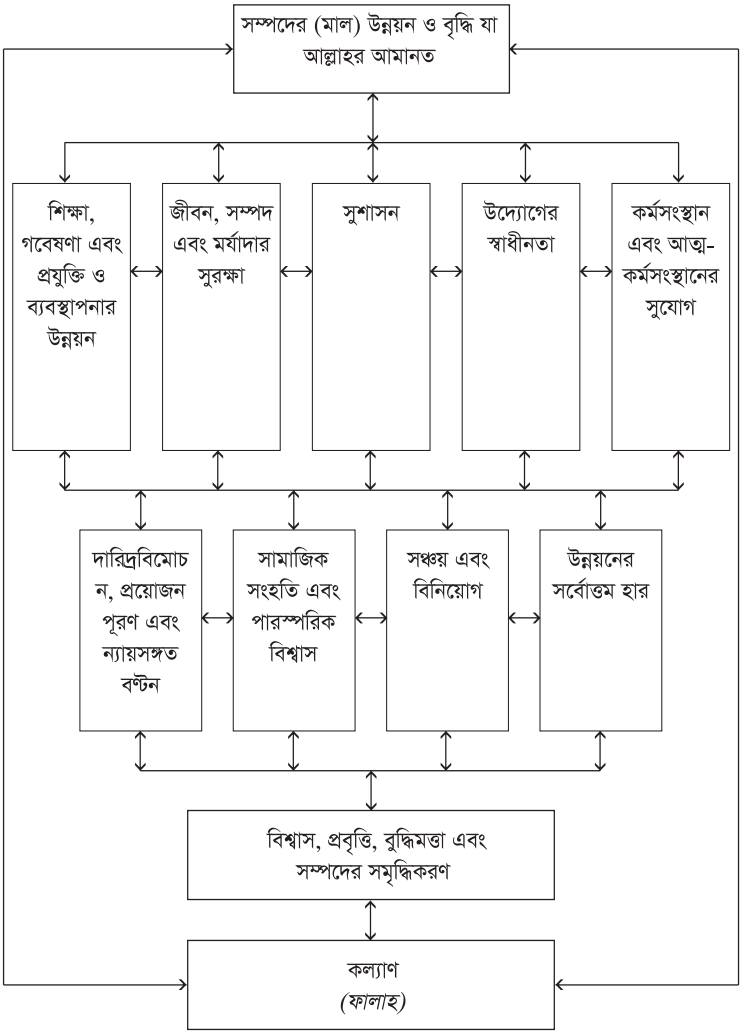


*চিত্র : ৬*

ইসলামের সুমহান লক্ষ্য সমাজ থেকে দারিদ্র্য এবং আয়ের বৈষম্য দূর করতে সম্পদের উন্নয়ন অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। এজন্য প্রথমেই জাকাত, *সাদাকা*,

*ওয়াকফ* ইত্যাদি খাতের ওপর প্রাথমিকভাবে নির্ভর না করে সর্বাগ্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। জাতির সমস্ত জনশক্তিকেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শামিল করতে হবে। শুধু ধনীক শ্রেণির ওপর মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা করা ঠিক হবে না। এতে বরং তাদের মাঝে কর ফাঁকির প্রবণতা বাড়বে। কুরআনেও মানব মনের এই প্রবণতার কথা বলা হয়েছে (আল-কুরআন, ৪৭:৩৭)।[৮৩] সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ওপর পর্যালোচনা করে ক্রসল্যান্ড (Crossland) বলেছেন, 'ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে যেকোনো বড় অংকের সম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ করলে সেটি তাদের মাঝে এক নিদারুণ হতাশা এবং উদ্যমহীনতা তৈরি করে'।[৮৪] মুসলিম দেশগুলোতেও সম্পদের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। তার চাইতে সমাজের সবাইকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করে সার্বিক জাতীয় আয় বৃদ্ধিই দারিদ্র্যবিমোচন এবং আর্থিক অসাম্য দূরীকরণের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। এর অংশ হিসেবে মানবসম্পদ শক্তিশালী করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে, যার অন্তর্ভুক্ত আছে– সমাজ সংস্কৃতিতে উন্নয়নমুখী প্রবণতা চালু, শিক্ষা-প্রযুক্তিতে অগ্রগতি; কঠোর পরিশ্রমী, বিবেচক, নিয়মানুবর্তী, দক্ষ ও সুশৃঙ্খল জনশক্তি গড়ে তোলা, যারা গবেষণার মাধ্যমে লাগসই নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্যবহার করতে পারবে; সমাজে উন্নয়নের লক্ষ্যে ঐক্য, সংহতি প্রতিষ্ঠা; জনগণের মধ্যে মিতব্যয়ী, মিতাচারী জীবনধারা চালু ইত্যাদি। বাস্তবে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে মুসলিমদের মাঝে এসব গুণ অনুপস্থিত। এমনকি সেসব স্থানে স্কুল, কলেজ, মাদরাসাগুলোতে এমন জীবনমুখী, দ্বীনের অনুসারী শিক্ষা ব্যবস্থাও চালু নেই।

এভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নের পর এটিও জরুরি যে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক মূলনীতিগুলো ইসলামের আলোকে পুনর্গঠিত করা, যাতে এ সবকিছুই মানবকল্যাণ এবং উন্নয়নে নিয়োজিত হয়। এ ব্যাপারে অমুসলিম দেশগুলোর উন্নয়নের মডেল থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের যেসব মূলনীতি *শরিয়াহসম্মত* সেগুলো গ্রহণ বা *মাকাসিদের* আলোকে ইসলামী সমাজে সেগুলোর অভিযোজন করতে কোনো দ্বিধা করা উচিত হবে না।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অধিকতর *ইনসাফ* কায়েম করতে হলে ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলাকে প্রণোদনা দিতে হবে। এতে কর্মসংস্থান বাড়বে, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে; দরিদ্ররাও ক্ষুদ্রশিল্পের মালিক হতে পারবেন। এর জন্য

ভোকেশনাল ট্রেনিং, মাইক্রো-ফাইন্যান্সের সম্প্রসারণ, গ্রাম এবং বস্তি এলাকার পণ্য শহরে বিপণনের সহজতম সুবিধা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমাদের অভিজ্ঞতা এটিই যে, সুদভিত্তিক মাইক্রো-ফাইন্যান্স দারিদ্র্য বিমোচনে বেশি ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে না। এর কারণ চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রক্রিয়ায় চূড়ান্তভাবে সেগুলোর চক্রবৃদ্ধি সুদের হার ৩০% থেকে ৪৫%-এ দাঁড়ায়। ফলে প্রায়ই ঋণগ্রহীতাদের ঋণের দায় শোধ করতে গিয়ে ভিটেবাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়।[৮৫] গত দুই দশকে ইসলামী মাইক্রো-ফাইন্যান্স পল্লী-দারিদ্র্যবিমোচনে সবচেয়ে সফল মডেল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পুঁজির মালিকানা হলো সম্পদ সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি এবং দরিদ্ররা প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না যদি তাদের পুঁজির অ্যাকসেস না থাকে। তাই মানবিক বিবেচনায় সুদমুক্ত ভিত্তিতে অতি দরিদ্রদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য জাকাত ও ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্ষুদ্রঋণ একীভূত করার প্রয়োজন হবে।[৮৬] যারা সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য ইসলামী ফাইন্যান্সের লাভ-লোকসান ভাগাভাগি এবং বিক্রয় ও ইজারাভিত্তিক পদ্ধতিগুলোকে জনপ্রিয় করতে হবে।

## উপসংহার

এতক্ষণের আলোচনায় এটি দেখা গেল যে, চূড়ান্ত মানবকল্যাণের জন্য সব ধরনের উপাদানই ইসলামী ব্যবস্থায় আছে। মানুষের জীবনসত্তা, ঈমান, *আকল* (বুদ্ধিমত্তা), প্রজন্ম ও সম্পদের উন্নয়ন এবং জীবনের জন্য সামগ্রিক কল্যাণের দিকেই ইসলামের লক্ষ্য; পাশ্চাত্য অর্থনীতির মতো শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যেই ইসলামের উদ্যোগ সীমাবদ্ধ নয়। *মাকাসিদে* বর্ণিত এই পাঁচটি মূল লক্ষ্যের সুষম এবং সফল অর্জনের মাধ্যমে ইসলামবর্ণিত পাঁচ তারকা মানের উন্নয়ন ও জগতের কল্যাণ যখন নিশ্চিত হবে (চিত্র-৭ দেখুন), তবেই মুসলিম বিশ্বের পক্ষে নবী সম্পর্কে কুরআন যা বলে তার প্রতিফলন হওয়া সম্ভব হবে– 'আমরা আপনাকে মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ প্রেরণ করেছি' (আল-কুরআন, ২১:১০৭)।

ইসলামে বর্ণিত *মাকাসিদের* সব লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে শুধু আর্থিক প্রবৃদ্ধির চেষ্টায় সীমাবদ্ধ থাকলে মুসলিম দেশগুলোতে সাময়িক কিছু উন্নতি দেখা যাবে; হয়তোবা তা চোখ ধাঁধানো, তাক লাগানো হবে, কিন্তু তা হবে ক্ষণস্থায়ী। কারণ মানুষের ঈমান, *আকল*, নৈতিকতা ইত্যাদি বাদ দিয়ে যে

আর্থিক সমৃদ্ধি তা চূড়ান্তভাবে আর্থিক অসাম্য, পারিবারিক বন্ধনের ভাঙন, তরুণ প্রজন্মের অস্থিরতা ও অপরাধপ্রবণতা এবং সমাজে অস্থিতিশীলতা নিয়ে আসে।

*চিত্র ৭ : মাকাসিদ আল-শরিয়াহর আলোকে মানবকল্যাণ*

এই পতন ধীরে ধীরে বৃত্তাকার কার্যকারণের মাধ্যমে রাজনীতি, সমাজ এবং অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হতে পারে, যা ইবন খলদুন তাঁর *মুকাদ্দিমাতে*[৮৭] জোর দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দীর পতনের ফলে মুসলিম বিশ্ব যে নিম্নবিন্দুতে পৌঁছেছে তার থেকেও আরো অবনতির দিকে নিয়ে যাবে।

# টীকা

১. এক্ষেত্রে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে রাহমাতুল্লিল আলামিন। এর অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সা.-কে জগতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ গোটা জগতের কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন। এখন তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর উম্মতের দায়িত্ব জগতের কল্যাণ নিশ্চিত করা। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিকুল যথা– মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, তৃণলতা, বৃক্ষ, পরিবেশ ইত্যাদি সবকিছুকে সংরক্ষণের দায়িত্ব মানুষের (দেখুন *al-Qurtubi*, ১৯৫২, ভল্যুম-১, পৃ : ১৩৮)।

২. ইসলামের শিক্ষার সর্বজনীনতার জন্য এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ (কুরআন ৭:১৫৮, ৩৪:২৮)। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাসূল সা.-কে রাহমাতুল্লিল আলামিন বলা হয়েছে– রাহমাতুল্লিল মুসলিমিন বলা হয়নি।

৩. কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে যে, বিশ্বের প্রতিটি জাতির জন্য আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন (আল-কুরআন, ১১:৭)। 'তোমাকে এমন কিছু বলা হচ্ছে না, যা তোমার পূর্ববর্তী নবীদের বলা হয়নি' (আল-কুরআন ৪১:৪৩)– এই আয়াতটি ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীনতা নিশ্চিত করে।

৪. Hausman এবং McPherson, ১৯৯৩, পৃ : ৬৯৩।

৫. Easterlin, ২০০১, পৃ : ৪৭২। আরো দেখুন Easterlin, ১৯৭৪ এবং ১৯৯৫; Oswald, ১৯৯৭; Blanchflower এবং Oswald, ২০০০; Diener এবং Oishi ২০০০ এবং Kerry, ১৯৯৯।

৬. এগুলোর মাঝে আছে সুষম খাদ্য ও পানীয়, সম্মানজনক শালীন পোশাক পরিধানের সামর্থ্য, স্বাস্থ্যসম্মত-আরামদায়ক আবাসন, সুচিকিৎসার অধিকার, পরিবহন, সুশিক্ষা, পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি।

৭. কয়েকজন বিখ্যাত *মাকাসিদ* পণ্ডিত হচ্ছেন: al-Maturidi (মৃত্যু : ৩৩৩ হি./ ৯৪৫ খ্রি.), al-Shashi (মৃত্যু ৩৬৫ হি./ ৯৭৫ খ্রি.), al-Baqillani (মৃত্যু : ৪০৩ হি./ ১০১২ খ্রি.), al-Juwayni (মৃত্যু : ৪৭৮ হি./ ১০৮৫ খ্রি.), al-Ghazali (মৃত্যু : ৫০৫ হি./ ১১১১ খ্রি.), Fakhr al-Din al-Razi (মৃত্যু : ৬০৬ হি./ ১২০৯ খ্রি.), al-Amidi (মৃত্যু : ৬৩১ হি./ ১২৩৪ খ্রি.), Izz al-Din Abd al-Salam (মৃত্যু : ৬৬০ হি./ ১২৫২ খ্রি.), IbnTaymiyyah (মৃত্যু : ৭২৮ হি./ ১৩২৭ খ্রি.), al-Shatibi (মৃত্যু : ৭৯০ হি./ ১৩৮৮ খ্রি.) এবং Ibn Ashur (মৃত্যু : ১৩৯৩ হি./ ১৯৭৩ খ্রি.)। এ বিষয়ে সমকালীন

আলোচনার জন্য দেখুন : Masud, ১৯৭৭; al-Raysuni, ১৯৯২; Ibn al-Khojah, ২০০৪, ভল্যুম-২, পৃ : ৭৯-২৭৮; Nyazee, ১৯৯৪, পৃ : ১৮৯-২৬৮; al-Khadimi, ২০০৫; এবং Awdah, ২০০৬।

৮. দেখুন Izz al-Din Abd al-Salam, ভল্যুম-১, পৃ : ৩-৮; Ibn Ashur, ২০০১, পৃ : ২৭৪, ২৯৯ এবং Nadvi, ২০০০, ভল্যুম-১, পৃ : ৪৮০।

৯. এই বইতে দেওয়া সকল মৃত্যুর তারিখ প্রথমে হিজরি সাল অনুসারে অতঃপর ইংরেজি সাল অনুসারে।

১০. Al-Ghazali, al-Mustasfa, ১৯৩৭, ভল্যুম-১, পৃ : ১৩৯-১৪০; আরো দেখুন: al-shatibi, ভল্যুম-১, পৃ : ৩৮ এবং ভল্যুম-৩, পৃ : ৪৬-৪৭।

১১. Izz al-Din Abd al-Salam, লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুসৃত পন্থাও *শরিয়াহর* আলোকে বৈধ হতে হবে, ভল্যুম-১, পৃ : ৪৬; al-Shatibi, something without which an obligation cannot be fulfilled is also obligatory, ভল্যুম-২, পৃ : ৩৯৪; ১৯৬৭, পৃ : ৭৮৪ এবং ১০৮৮; Nadvi, ২০০০, ভল্যুম-১, পৃ : ৪৮০।

১২. Iqbal, ১৯৫৪, পৃ : ১৫০। Mustafa al-Zarqa.

১৩. Al-Raysuni, ১৯৯২, পৃ : ৪২।

১৪. গাজ্জালির মতো আল-শাতিবিও একই ধারাক্রম অনুসরণ করেছেন, (ভল্যুম-১, পৃ : ৩৮) আবার একই বইয়ের ভল্যুম-৩-এর ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় তিনি ভিন্ন ধারাক্রমও ব্যবহার করেছেন; সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে; *হিফদ আল-দ্বীন*, *হিফদ আল-নাফস*, *হিফদ আল-নাসল*, *হিফদ আল-মাল* এবং *হিফদ আল-আকল*। এই বিষয় থেকে এটাই বুঝা যায় যে, গাজ্জালি বর্ণিত ধারাক্রম যে সবসময় অবশ্যপালনীয় এমনটি আল-শাতিবি মনে করেননি; স্থান-কাল-পাত্র ভেদে *শরিয়াহর* মূল লক্ষ্য বিবেচনার ধারাক্রম বিভিন্ন হতে পারে। আরও দেখুন Al-Raysuni, ১৯৯২, পৃ : ৪১-৫৫, বিশেষভাবে পৃ : ৪৮।

১৫. Al-Razi, ১৯৯৭, ভল্যুম-৫, পৃ : ১৬০। তার অনুসৃত ধারাক্রম হচ্ছে যথাক্রমে *আল-নাফস*, *আল-মাল*, *আল-নাসাব*, *আল-দ্বীন* এবং *আল-আকল*। তিনি *আল-নাসলের* বদলে *আল-নাসাব* শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ বংশানুক্রম বা বংশপরিচয়। এর আরেকটি অর্থ ভবিষ্যত প্রজন্ম– এই অর্থে এই শব্দ গাজ্জালিও তার কোনো কোনো লেখায় ব্যবহার করেছেন।

১৬. Al-Qurtubi, ১৯৫২, ভল্যুম-১৪, পৃ : ২৪-৩১। আরো দেখুন Ibn Ashur, ২০০১, পৃ : ২৬১-২৬৬।

১৭. Sydney Hook (সম্পাদক), *Determinism and Freedom in the Age of Modern Science* (১৯৫৮), Sydney Morgenbesser এবং James Walsh (সম্পাদক), *Free Will* (১৯৬২), এই বইটিতে সম্পাদকদ্বয় আধুনিক এবং সমকালীন অনেক লেখকের লেখার মাধ্যমে 'নিয়ন্ত্রণবাদ' এবং 'অস্তিত্ববাদের' সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

১৮. Chapra, ১৯৯২, পৃ : ২০২-২০৬।

১৯. Jean-Paul, Sartre, *Being and Nothingness*, অনুবাদ, Hazel Barnes (১৯৫৭)। আরো দেখুন Stevenson (১৯৭৪), পৃ : ৭৮-৯০; এবং Anthony Manscr, *Sartre : A Philosophic Study*, (১৯৬৬)।

২০. Sartre (১৯৫৭), পৃ : ৪৩৯ এবং ৬১৫।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৮।

২২. এম্পিরিকেল গবেষণা এই তথ্যই দেয় যে, উঁচুমানের ধর্মীয় ও নৈতিক চর্চা মানুষকে মানসিক শান্তি দেয়, মানসিক চাপ কমায়, আত্মিক প্রশান্তি আনে (Ellison, ১৯৯১ এবং ১৯৯৩; Iannaccone, ১৯৯৮)।

২৩. এই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে এটি বুঝানো যে, আল্লাহর সাথে শিরক করার মাধ্যমেই যাবতীয় বেইনসাফি শুরু হয়। Al-Qurtubi এবং Ibn Kathir তাদের তাফসিরে এ বিষয়টি বিস্তৃত করেছেন। কুরআন এবং সুন্নাহর দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ইসলামে বর্ণিত *ইনসাফ* মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে জগতের সকল মানুষ এবং মানুষ ছাড়াও অন্য সব জীব ও প্রকৃতির উপাদানের ওপর প্রযোজ্য; কারো ওপর অবিচার বা বাড়াবাড়ি করা যাবে না। Fakhr al-Bin al-Razi-এর *Tafsir-al-Kabir*, ভল্যুম-৭ পৃ : ৩০ দেখুন।

২৪. 'যারা অবিচার করবে তাদের আখিরাত ঘোর অন্ধকার'। সহিহ মুসলিম, ভল্যুম-৪, পৃ : ১৯৯৬, *Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, Bab Tahrim al-Zulm*, জাবির ইবন আবদুল্লাহ বর্ণিত। আরও দেখুন আল-কুরআন, ২৪:৪০।

২৫. Chapra, ১৯৮৫, পৃ : ২৭-২৮।

২৬. Al-Mawardi, *Adab*, ১৯৫৫, পৃ : ১২৫।

২৭. Ibn Taymiyyah, *Majmu Fatawa*, ভল্যুম-৮, পৃ : ১৬৬। আরও দেখুন *Minhaj al-Sunnah*, ১৯৮৬, ভল্যুম-৫, পৃ : ১২৭।

২৮. Imam Ibn Taymiyyah, *Al-Hisba fi al-Islam*, ১৯৬৭, পৃ : ৯৪।

২৯. Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, পৃ : ২৮৭, 'বেইনসাফি এবং অবিচার উন্নয়নকে ধ্বংস করে'।

৩০. কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সকল শিক্ষার সারবত্তাই হচ্ছে এই মূল্যবোধগুলো। যে এগুলো চর্চা করবে না বা লঙ্ঘন করবে, সে ভালো মুসলিম নয়।

৩১. 'তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্ভ্রম সবই পবিত্র যেমন পবিত্র হজের এই দিনটি এবং এই মক্কা শহর' Ibn Khathir, ১৯৮১; সুরা হুজুরাত-এর ৪৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন কাসির এই হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, ১৯৮১, ভল্যুম-৩, পৃ : ৩৬৫।

৩২. খলিফা ওমর রা. বলেছেন, 'কোন অধিকারে তোমরা মানুষদের ক্রীতদাস বানাও যখন তারা মায়ের গর্ভ থেকে মুক্ত মানুষ হিসেবে জন্ম নেয়', Ali al-Tantawi এবং Naji al-Tantawi, *Akhbaru Umar*, ১৯৫৯, পৃ : ২৬৮।

৩৩. কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, 'আমরা প্রত্যেক জাতির জন্য পথ প্রদর্শনকারী পাঠিয়েছি' (আল-কুরআন, ১৬:৩৬) এবং 'তোমার পূর্বে আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি, তাদের কারো কারো সম্পর্কে তোমাকে বলেছি এবং অনেকের সম্পর্কেই তোমাকে বলা হয়নি' (আল-কুরআন, ৪০:৭৮; ৪:১৬৪)। আবুজর বর্ণিত একটি হাদিসে জানা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির কাছে প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। (*তাফসির ইবন কাসিরে* সূরা নিসার ১৬৪ নম্বর আয়াতের তাফসির দেখুন)। ইসলাম সেই মহান ধর্ম যা সৃষ্টির আদি থেকে আসা সকল নবী-রাসূলকে স্বীকৃতি দেয়।

৩৪. North, ১৯৯০, পৃ : ৯৩-৯৪।

৩৫. Chapra, *Muslim Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform,* (২০০৮)।

৩৬. Al-Suyuti, *al-Jami al-Saghir*, আনাস ইবন মালিক বর্ণিত হাদিস।

৩৭. Ibn Hazm, ভল্যুম- ৬, পৃ : ১৫৬।

৩৮. 'আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সমাজের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব দিয়েছেন', al-Shatibi, ভল্যুম-২, পৃ : ১৭৭।

৩৯. ফিকাহ মতে এই শব্দগুলোর সংজ্ঞা জানতে দেখুন : al-Shatibi, al-Muwafaqat, ভল্যুম ২, পৃ. ৮-১২; Anas Zarqa, I*slamic Economics : An Approach to Human Welfare*, in K. Ahmad, ১৯৮০, পৃ : ১৩-১৫। Imam Hasanal-Banna, *Majmuah Rasail* (১৯৮৯), পৃ : ২৬৮ এবং Hadith al-Thulatha (১৯৮৫), পৃ : ৪১০, Sayyid Abul Ala Mawdudi, *Islam awr Jadid Maashi Nazariyyat*, ১৫৫৯, পৃ : ১৩৬-১৪০।

৪০. আল-কুরআন, ৭:৩১, ১৭:২৬-৭, ২৫:৬৭, ৬:১৪১, ২৮:৭৭, এসব আয়াতে বিলাসী ও অপচয়কারীদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। রাসূল সা. তাঁর হাদিসে বিলাসী জীবন পরিত্যাগ করে সহজ সাদাসিধা জীবনাচার করতে বলেছেন। (Tabrizi, *Mishkat*, ১৯৬৬, ভল্যুম-১, পৃ : ১৩৩)। তিনি আরও বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে বলেছেন যেন আমি তোমাদের বিনয়ী ও মিতব্যয়ী হতে উপদেশ দেই এবং কখনও গর্ব-অহংকার না করতে আদেশ দেই'। *Sunan Abu Dawud*, ১৯৫২, ভল্যুম-২, পৃ : ৫৭২); তিনি আরও বলেছেন : 'আল্লাহ তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন যারা জৌলুসপূর্ণ কাপড় পরিধান করে অহংকার করে', *Sahih al-Bukhari*, ভল্যুম-৭, পৃ : ১৮২ এবং *Sahih Muslim*, ১৯৫৫, ভল্যুম-৩, পৃ : ১৬৫১)। তিনি আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আর্থিক সামর্থ্য থাকার পরও বিনয় এবং ভদ্রতার কারণে জৌলুসপূর্ণ পোশাক পরা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখবে; হাশরের ময়দানে আল্লাহ সমগ্র মানবজাতির সামনে তাকে এই সুযোগ দেবেন যে, সে তার ইচ্ছেমতো যেকোনো সুন্দর পোশাক পরতে পারবে (*Jami al-Tirmidhi, Tuhfah al-Ahwadhi*, ভল্যুম-৩, পৃ : ৩১২-৩১৩, মুয়াজ ইবন আনাস আল-জুহানি বর্ণিত হাদিস)। 'খাও এবং পান করো, দরিদ্রকে দান করো এবং জৌলুসবর্জিত শালীন পোশাক পরো', (Suyuti, *al-Jami al-Saghir*, ভল্যুম-২, পৃ : ৯৬, ইবন উমর কর্তৃক বর্ণিত, *Musnad-Ahmad*, *al-Nasai*, *Ibn Majah* এবং *al-Hakim*-এ উদ্ধৃত)।

৪১. রাসূল সা. ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছেন (*Sunan Abu Dawud*, ১৯৫২, ভল্যুম-১, পৃ : ৩৮২, আওফ ইবন মালিক বর্ণিত)। তিনি আরও বলেছেন, 'দানের ক্ষেত্রে উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাতের (গ্রহীতার হাত) চেয়ে শ্রেষ্ঠ' (*al-Bukhari*, ভল্যুম-২, পৃ : ১৩৩, আবদুল্লাহ ইবন উমর

বর্ণিত)। এছাড়াও যাদের আসলে প্রয়োজন নেই, যারা প্রকৃত মিসকিন নয় তাদের দান করাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেছেন (*Sunan Abu Dawud*, ১৯৫২, ভল্যুম-১, পৃ : ৩৭৯; *al-Nasai*, ১৯৬৪, ভল্যুম-৫, পৃ : ৭৪, *Ibn Majah*, ১৯৫২, ভল্যুম-১, পৃ : ৫৮৯)। এছাড়াও তিনি তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদার কথা বলেছেন যারা পৃথিবীতে হালাল রিজিকের সন্ধান করে এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও পরনির্ভরতা থেকে দূরে থাকে। তিনি বলেছেন, এমন ব্যক্তিরা হাশরের দিনে পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলোকোজ্জ্বল মুখ নিয়ে উপস্থিত হবেন (Tabrizi, *Mishkat*, ১৩৮১ হিজরি, ভল্যুম-২, পৃ : ৬৫৮, আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, *বায়হাকির* Shuab al-Iman-এ উদ্ধৃত)।

৪২. কুরআন মুসলমানদের নামাজ শেষে জমিন জুড়ে আল্লাহর দেওয়া রিজিক সন্ধান করতে বলেছে (৬২:১০)। রাসূল সা. বলেছেন, হালাল রিজিক অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ (Suyuti, *al-Jaimi al-Saghir*, আনাস ইবন মালিক বর্ণিত, পৃ : ৫৪)। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন, 'একজন মানুষের জন্য তার নিজের হাতে, নিজের চেষ্টায় অর্জিত রিজিকের চাইতে উত্তম আর কোনো রিজিক হতে পারে না' (*Sunan Ibn Majah*, ১৯৫২, ভল্যুম-২, পৃ : ৭২৩, মিকদাম ইবন মাদিকারিব বর্ণিত)। রাসূল সা.-এর মতে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা মানে এ নয় যে বান্দা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে। একবার একজন সাহাবি রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি (সাহাবি) উটের রশি খুঁটির সাথে বেঁধে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন নাকি উট মুক্ত করে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন? জবাবে রাসূল সা. বললেন, 'উটের রশি খুঁটির সাথে শক্তভাবে বাঁধো, তারপর আল্লাহর ওপর নির্ভর করো'। (*Kitab al-Kasb*, Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybai [al-Sarakhsi]); *Kitab al-Mabsut*, ভল্যুম-৩০, পৃ : ২৪৯)। খলিফা উমর রা. তাঁর খিলাফতের সময় একটি আইন জারি করেন তা হচ্ছে, 'তোমাদের কেউ কাজ না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না এবং এমনটি আশা করবে না যে আল্লাহ তোমাদের রিজিক পৌঁছে দেবেন। তোমাদের শ্রম করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের একে অপরের কাছ থেকে কাজের বিনিময়ে রিজিক দিবেন' Ali al-Tantawi এবং Naji al-Tantawi, *Akhbar Umar*, পৃ : ২৬৮)।

৪৩. রাসূল সা. বলেছেন, 'আল্লাহ পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন মুসলিমদের পছন্দ করেন' (ইবন ওমর বর্ণিত হাদিস) *al-Tabarani, al-Kabir* এবং *al-Bayhaqi*, ভল্যুম-২, পৃ : ৫২৪: ১০।

৪৪. এই বিষয়ে আইনবিদদের পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্স দিতে গেলে বেশ দীর্ঘ হবে। পাঠক দেখুন– *Kitab al-Kasb, al-Shaybaniin al-Sarakhsi, Kitab al-Mabsut*, ভল্যুম-৩০ পৃ : ৩৪৪-৩৮৭। বিশেষভাবে পৃ : ২৪৫, ২৫০ এবং ২৫৬; Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, ভল্যুম-২, পৃ : ৬০-৬৪; al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, ভল্যুম-২, পৃ : ১৭৬-১৭৭, al-Abbadi, ১৯৭৪-৭৫, ভল্যুম- ২, পৃ : ২২-২৫।

৪৫. স্ত্রী সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ 'জাওজ' এবং 'মাহিবা' বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। এই শব্দ দুটোর অর্থ যথাক্রমে অংশীদার এবং 'বন্ধু' কোনোভাবেই অধীনস্ত বা অধস্তন নয়।

৪৬. রাসূল সা. বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ যার চরিত্র উত্তম', *al-Bukhari*, ভল্যুম-৮, পৃ : ১৫।

৪৭. গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, মানুষের ধার্মিক জীবনযাপন পারিবারিক জীবনকে স্থিতিশীল রাখে এবং তালাকের মতো ঘটনা কমায়। Iannaccon, ১৯৯৮; Lehrer এবং Cheswick, ১৯৯৩; Gruber, ২০০৫।

৪৮. আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিসটি al-Suyuti তাঁর *al-Jami al-Saghir*-এ উদ্ধৃত করেছেন। মূল হাদিসটি দেখুন– *Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi*, ভল্যুম-১, পৃ : ১০২।

৪৯. জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা.-এর বয়ানে সহিহ মুসলিমে উদ্ধৃত *Kitab al-Manasik, Bab Hajj al-Nabi*, ভল্যুম-২, পৃ : ৮৮ *Abu Dawud, Kitab al-Manasik, Bab Sifat Hajj al-Nabi; Ibn Majah* এবং *Musnad Ahmad*.

৫০. আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদিসটি আল-হাকিম তার সংকলনে উদ্ধৃত করেছেন; হাদিসটি হচ্ছে, 'আমি দুটি দুর্বল পক্ষের হক রক্ষার জন্য তাগিদ দিচ্ছি, এরা হচ্ছে ইয়াতিম ও নারী', Mustadrak, ভল্যুম-১, পৃ : ৬৩। হাদিসটি একটি সহিহ হাদিস হিসেবে *মুসলিমে* সংকলিত।

৫১. ইবন আব্বাস রা. বর্ণিত হাদিস, *Abu Dawud, al-Hakim*, ভল্যুম-৩, পৃ : ৬৮।

৫২. উমর রা. বর্ণিত হাদিস বুখারি উদ্ধৃত করেছেন; *Kitab al-Libas, Bab ma Kana al-Nabi Yatajawwaz minal-Libas wa al-Bust*, ভল্যুম-৪, পৃ : ২৮১।

৫৩. Toynbee, *Somervell's abridgement*, ১৯৫৮, ভল্যুম-২, পৃ : ৩৮০; ভল্যুম-১, পৃ : ৪৯৫-৪৯৬।

৫৪. Will এবং Ariel Durant, ১৯৬৮, পৃ : ৫১।

৫৫. Schadwick, ১৯৭৫, পৃ : ২২৯ এবং ২৩৪।

৫৬. Williams, ১৯৮৫, পৃ : ১৭৪।

৫৭. বর্তমানে এসব বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে। পাঠক আমার গ্রন্থও দেখতে পারেন। Chapra, ২০০৭-এ এবং ২০০৭-বি।

৫৮. *Religion in Contemporary Europe* গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী এই কথা বলেছেন যে, তারা অনুভব করছেন যে, বিগত ২০০ বছরের আন্তঃধর্ম সংঘাত এখন ক্রমে সংলাপ ও সমঝোতার দিকে এগুচ্ছে (Fulton এবং Gee, ১৯৯৪)।

৫৯. Schweitzer, ১৯৪৯, পৃ : xii.

৬০. Schweitzer, ১৯৪৯, পৃ : ২২-২৩, ৩৮-৩৯, ৯১।

৬১. Friedman, ২০০৫।

৬২. উদ্ধৃত, al-Mawardi, ১৯৫৫, পৃ : ১২১, 'ইবন আশুর যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে যদি রাষ্ট্র কর্তৃক *শরিয়াহর* অনুসরণ করা না হয়, অথবা সমাজের জনগণ পুরো আন্তরিকতার সাথে তা অনুসরণ না করে, তবে *শরিয়াহর* সুফল মানবজাতি পরিপূর্ণভাবে পেতে পারে না' (২০০১, পৃ : ৩৭৬)।

৬৩. মাকিল ইবন ইয়াসির বর্ণিত হাদিস বুখারি সংকলন করেছেন *Kitab al-Ahkam*, ভল্যুম-৯, পৃ : ৮০।

৬৪. Imam Hasan al-Banna, *Majmuah Rasa'il al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna*, ১৯৮৯, পৃ : ২৫৫।

৬৫. Al-Ghazali, *Ihya*, ভল্যুম-১, পৃ : ৮৩।

৬৬. Ibn Taymiyyah, *Majmu al-Fatawa*, ভল্যুম-২, পৃ : ৪৯০।

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ : ৪৯০।

৬৮. Mustafa al-Zarqa, *al-Aql wa al-Fiqh*, ১৯৯৬, পৃ : ১৪।

৬৯. Al-Juwayni, *al-Ghiyathi*, ১৪০০, ভল্যুম-১, পৃ : ২৯৫।

৭০. Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, ২য় সংস্করণ, ২০০১, পৃ : ১৬৬।

৭১. Abi al-Fadl Abd al-Salam (মৃত্যু : ১৪২৪ হি./ ২০০৪ খ্রি.), *al-Tajdid wa al-Mujaddidun fi Usul al-Fiqh* (Cairo: al-Maktabah al-Islamiyah), পৃ : ৫৭৬-৫৭৭।

৭২. এই হাদিস দুটো হচ্ছে, 'প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ', এবং 'একজন আবিদ ব্যক্তির ওপর একজন আলিম [জ্ঞানী] ব্যক্তির প্রাধান্য এই রকম যেমন আকাশের মৃদু আলোর তারাগুলোর ওপর পূর্ণিমার চাঁদের প্রাধান্য' (আনাস ইবন মালিক কর্তৃক এবং আবু আল-দারদা কর্তৃক বর্ণিত এবং *ইবনে মাজায়* উদ্ধৃত) ভল্যুম-১, পৃ : ৮১; হাদিস নম্বর- ২২৩ এবং ২২৪। (*Al Muqaddimah*, Bab: 17, *Fadl al-Ulama wa al-Hath Ala Talab al-Ilm*)। al- Qurtubi, *Jami Bayanal-Ilm wa Fadluhu*, ভল্যুম-১, পৃ : ৩-৬৩, এবং al-Ghazali, *Ihya*, ভল্যুম-১, পৃ : ৪-৮২।

৭৩. Abu Zahrah, *Usul of Fiqh*, ১৯৫৭, পৃ : ৩৫০।

৭৪. গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, ধর্মীয় এবং নৈতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্ম কম অপরাধপ্রবণ। তাদের মাঝে মাদকাসক্তি, ড্রাগ-আসক্তি, পর্নো চর্চা ইত্যাদি অপরাধপ্রবণতা কম। Iannaccon, ১৯৯৮, পৃ : ১৪৭৬; Bachman, et.al, ২০০২; Wallace এবং Williams, ১৯৯৭, Gruber, ২০০৫, Fukuyama, ১৯৯৭।

৭৫. সুরা আত-তালাক এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল কুরতুবি ইবন উমরের বয়ানে এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন।

৭৬. প্রাগুক্ত, আলি ইবন আবি তালিব কর্তৃক বর্ণিত।

৭৭. *Ibn Majah*, ভল্যুম-১, পৃ : ৩১।

৭৮. *Al-Bukhari, al-Adab al-Mufrad*, পৃ : ১১৩, Bab Tib al-Nafs।

৭৯. *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Mazalim*, Bab Man Qatala Duna Malihi Fahuwa Shahid, এবং *Sahih Muslim, Kitab al-Iman*.

৮০. Al-Razi, *al-Mahsul*, ১৯৯৭, ভল্যুম-৫, পৃ : ১৬০।

৮১. *Al-Bukhari, Kitab al- Jihad wa al-Siyar*.

৮২. এই প্রসঙ্গে রাসূল সা. বলেছেন : হাশরের ময়দানে কাউকে এক কদম নড়তে দেওয়া হবে না যতক্ষণ না সে চারটি প্রশ্নের উত্তর দেবে। এই চারটি প্রশ্ন হচ্ছে প্রথমত, তার জ্ঞান-সম্পদ সম্পর্কে, সে কতটুকু তা কাজে লাগিয়েছে; দ্বিতীয়ত, তার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে, সে কীভাবে তা অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে; তৃতীয়ত, তার জীবন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে , কীভাবে তাকে সে ব্যবহার করেছে এবং চতুর্থত, তার শরীর সম্পর্কে, সে কোন ধরনের পোশাক দিয়ে তা আবৃত করেছে (*Kitab al-Khanaj*, পৃ : ৪, Abu Yusuf উদ্ধৃত)।

৮৩. 'তিনি (আল্লাহ) যদি তোমাদের ধন সম্পদ তোমাদের কাছে চেয়ে বসেন এবং তোমাদের সবকিছুই পেতে চান তাহলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের গোপন দোষটি প্রকাশ করে দিবেন' (আল-কুরআন, ৪৭:৩৭)।

৮৪. Crossland, ১৯৭৪।

৮৫. Ahmad, ২০০৭, পৃ : xvii-xix এবং ৩২।

৮৬. Islamic Research and Training Institute Report (২০০৭)।

৮৭. ইবন খলদুন বর্ণিত এই চক্রের ব্যাখ্যা বুঝতে দেখুন : Chapra, ২০০০, পৃ : ১৪৫-১৫৯।

# গ্রন্থপঞ্জি


Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Cairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1952).

Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj* (Cairo: al-Matbah al-Salafiyyah, 2nd ed., 1352 ah). This book has been translated into English by Ben Shemesh A., *Taxation in Islam*, Vol. 3, (Leiden: Brill. 1969).

Ahmad, Khurshid, *Studies in Islamic Economics* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1980).

Ahmad, Qazi Kholiquzzaman, *Socio-Economic and Indebtedness-Related Impact of Micro-Credit in Bangladesh* (Dhaka: The University Press, 2007).

Alden, A. J., *Free Action* (London, 1961).

Awdah, Jasser, *Fiqh al-Maqasid: Inatah al-Ahkam al-Shariyyah bi Maqasidiha* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2006).

Banna, Imam Hasan al-, *Hadith al-Thulatha bi al-Imam Hasan al-Banna*, ed., Ahmad Isa Ashur (Cairo: Maktabah al-Qur'an, 1985).

Banna, Imam Hasan al-, *Majmuah Rasail al-Imam Hasan al-Banna* (Alexandria: Dar al-Da'wah, 1989).

Bachman, Jerald. et. al. *The Decline in Substance Use in Young Adulthood: Changes in Social Activities, Roles and Beliefs* (Mahway, NS: Lawrence Erlbaum Associates, 2002).

Bayhaqi, Imam Abu Bakr al-, *Shuab al-Iman*, Muhammad al-Said Bisyuni Zaghlul (ed.), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990).

Blanchflower, David, and Andrew Oswald, *"Well-being over Time in Britain and the USA"* (2000), NBER Working Paper 7487.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-, *al-Jami al-Sahih*, (Cairo: Muhammad Ali Subayh, n.d.).

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-, *al-Adab al-Mufrad*, 2nd ed. (Cairo: Qusay Muhibb al-Din al-Khatib, 1379 AH).

Chapra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1992).

Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 2000).

Chapra, M. Umer, *"The Case Against Interest: Is it Compelling?"* in *Thunderbird International Business Review*, 2007a 49/2, March/April, pp. 161-186.

Chapra, M. Umer, *"Challenges Facing the Islamic Financial Industry"* in M. Kabir Hassan and Merwyn Lewis (eds.), *Handbook of Islamic Banking* (Cheltenham, UK: Edward Elgar. 2007), pp. 325-357.

Chapra, M. Umer, *Muslim Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform* (Leicester. UK: The Islamic Foundation, 2008).

Crossland, C. A. R, *Socialism Now* (London: Jonathan Cape, 1974),

Diener, E, and Shigchiro Oishi, *"Money and Happiness: Income and Subjective Well-being"* in E. Diener and E. Suh, eds., *Culture and Subjective Well-being* (Cambridge, MA: MIT Press, 2000).

Easterlin, Richard, *"Does Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence"* in Paul David and Melwin Rcdcr, eds., *Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramwitz* (New York: Academic Press, 1974).

Easterlin, Richard, *"Will Raising the Income of all Increase the Happiness of All?"* in *Journal of Economic Behaviour and Organization,* 1995. 27: I, pp. 35-48.

Easterlin, Richard, *"Income and Happiness: Towards a Unified Theory"* in *Economic Journal*, 2001, III: 473.

Ellison, Christopher, *"Religious Involvement and Subjective Well-being"* in *Journal of Health and Social Behaviour*, 1991, 31:I, pp. 80-99.

Ellion, Christopher, *"Religion, the Life Stress Paradigm, and the Study of Depression"* in Jeffrey Levin, ed., *Religion in Aging and Mental Health: Theoretical Foundations and Methodological Frontiers* (Thousand Oaks, CA: Sage), pp.78-121

Friedman, Benjamin, *Moral Consequences of Economic Growth* (New York: Knopf, 2005).

Fulton, John, and Peter Gee (eds.), *Religion and Contemporary Europe* (Lampeter, UK: The Edwin Press, 2004). Murad Hofmann, *Muslim World Book Review*, 4/1997, pp. 40-41.

Ghazali, Abu Hamid al-, *Ihya Ulum al-Din* (Cairo: Maktabah wa Matbaah al-Mashhad al-Husayni, n.d.), 5 volumes.

Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mustafa* (Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1937).

Gruber, Jonathan, *"Religious Market Structure, Religious Participation, and Outcomes: Is Religion Good for You?"*, NBER Working Paper 11377, May (Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005).

Hausman, Daniel, and Michael McPherson, *"Taking Ethics Seriously: Economics and Contemporary Moral Philosophy"*, in the *Journal of Economic Literature*, June, 1993.

Hook, Sidney (ed.), *Determinism and Freedom in the Age of Modern Science* (New York: 1958).

Hout, Michael, and Andrew Greeley, *"Religion and Happiness"*, paper prepared for the annual meeting of the American Sociological Association, 2003.

Iannaccone, Laurence, *"Introduction to the Economics of Religion", Journal of Economic Literature*, September 1998, pp. 1465-1496.

Ibn al-Khojah, Muhammad al-Habib, *Bayna Ilmayyi Usul al-Fiqh wa Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah: Commentary on Ibn Ashur's book Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* (Qatar: Wizarah aI-Awqaf wa al-Shuun al-Islamiyyah, 2004).

Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, ed. Muhammad al-Tahir al-Maysawi (Jordan; Dar al-Nafais, 2001),

2nd ed. An English translation of this book was published: Ahmad al-Raysuni, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid al-Shariah*, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and intents of Islamic Law* (London and Washington: International Institute of Islamic Thought, 2006).

Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: Al-Maktabah al-Tijariyyah, n.d.).

Ibn Kathir, Abu al-Fida Ismail, *Tafsir al-Quran al-Azim* (Cairo: Isa al-Babi al-Halabi, n.d.).

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Cairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1952).

Ibn Taymiyyah, *Majmu Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah* (Riyadh: Matabi al-Riyadh. 1383-1963. 1963), ed. Abd al-Rahman al-Asimi.

Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, ed,. Abd al-Aziz Rabah (Damascus: Maktabah Dar aI-Bayan, 1967).

Ibn Taymiyyah, *Minhajal-Sunnah al-Nabawiyyah*, M. Rashad Salim (ed.), (Riyadh: Imam Muhammad Islamic University, 1986).

Iqbal, Muhammad, *Payam-e-Mashriq* (Lahore: Shaykh Mubarak Ali, 1954).

Islamic Research and Training Institute *'Framework for the Development of Microfinance Services'* (Jeddah: IRTI, 2007).

Izz al-Din Abd al-Salam (660/1252), *Qawaidal-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Marifah, n.d.).

Kerry, Charles, *'Does Growth Cause Happiness, or Does Happiness Cause Growth?'* in Kyklos, 1999; 52:I pp. 3-26.

Khadimi, Nur aI-Din Mukhtar al-, *Al-Ijtihad al-Maqasid: Hujjiyyatuh, Dawabituhu Majalatuhu* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2005),

Lehrer, Evelyn, and Carmel Chiswick, *'Religion as a Determinant of Marital Stability'*, Demography. 1993, 30, pp. 385-404.

Manser, Anthony, *Sartre: A Philosophic Study* (London: Athlone Press, 1966).

Mawardi, Abu al-Hasan Ali al-, *Adab al-Dunya wa al-Din Mustafa al-Saqqa* (ed.) (Cairo: Muastafa al-Babi al-Halabi,1955).

Mawdudi, Sayyid Abu al Ala, *Islam awr Jadid Maashi Nazariyyat* (Lahore: Islamic Publications, 1959).

Morgenbesser, Sidney, and James Walsh (eds.). *Free Will* (Englewood Cliffs, N.J.: 1962).

Mundhiri, Abd al-Azim al-, *al-Targhib wa al-Tarhib*, Mustafa M. Amarah, ed., (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).

Muslim, *Sahih Muslim*, Muhammad Fuad Abd al-Baqied, ed., (Cairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1955).

Nadvi, Ali Ahmad al-, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Muamalat al-Maliyyah* (Riyadh: Sharikah al-Rajihi al-Masrafiyyah li al-Istithmar, 2000).

Nasai, Imam Abu Abd al-Rahman ibn Shuayb al-, *Sunan al-Nasai al-Mujtaba* (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964),

Oswald, Andrew, *'Happiness and Economic Performance'*, in *Economic Journal*, 1997. Vol. 107: 445, pp. 185-1831.

Qarafi, Shahab al-Din Ahmad, *al-Dhakhirah*, ed. M. Hijji (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994).

Qurtubi, Abu Abdallah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-, *al-Jami li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi).

Qurtubi, Abu Umar Hafiz ibn Abd al-Barr aI-Namiri al-, *Jami Bayan al-Ilm wa Fadluhu* (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, n.d.).

Razi, Fakhar al-Din al-, *al-Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, n.d.), 3rd ed.

Razi, Fakhr al-Din al-, *al-Mahsul fi Ilm Usul al-Fiqh*, ed. Jabir Fayyad al-Alwani (Beirut: AI-Risalah. 1997).

Raysuni, Ahmad al-, *Nazariyyah al-Maqasid Ind al-Imam al-Shatibi* (Riyadh: Al-Dar al- Alamiyyahli al Kitab al-Islami, 1992), 2nd cd.

Sarakhsi, Shams al-Din al-, *Kitab al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Marifah, n.d.), particularly *'Kitab al-Kasb'* of al-Shaybani in Vol. 30.

Sartre, Jean-Paul, *Being and Nothingness*, tr. by Hazel Barnes (London: Methuen, 1957).

Shatibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, n. d.).

Stevenson, Leslie, *Seven Theories of Human Nature*, (Oxford: Clarendon Press, 1974).

Suyuti, Jalalal-Din al-, *al-Jami al-Saghir* (Cairo: Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, n. d.).

Tabrizi, Wali al-Din al-, *Mishkat al-Masabih*, ed. M. Nasir al-Din al-Albani (Damascus: al-Maktab al-Islami, 1966).

Tantawi, Ali al- and Naji al-, *Akhbaru Umar* (Damascus: Daral-Fikr, 1959).

Tirmidhi, Muhammad ibn Isa, *Jami al-Tirmidhi with commentary*, *Tuhfah al-Ahwadhi* (Beirut: Daral-Kitab al-Arabi, n.d.).

Wallace, John, and David Williams, *'Religion and Adoleseent, Health Compromising Behaviour'*, in J. L. Schulenburg, J. L. Maggs, and K. Hurrelmar, eds., *Health Risks and Developmental Transitions During Adolescence* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997). pp. 444-468.

Williams, Bernard, *Ethics and the Limits of Philosophy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985).

Zarqa, Anas. 'Islamic Economics: An Approach to Human Welfare' in Khurshid Ahmad (ed.) *Studies in Islamic Economics*, International Centre for Research in Islamic Economics, (King Abdul Aziz University, Jeddah, and the Islamic Foundation, U.K., 1980, pp. 13-15.

Zarqa, Mustafa Ahmad al-, *al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-jadid* (Damascus: Matabi Alf Ba al-Adib, 1967).

Zarqa, Mustafa Ahmad al-, *al-Aql wa al-Fiqh fi al-Fahm al-Hadith* (Damascus: Dar al-Qalam, 1996).

## গ্রন্থ পরিচিতি

'মাকাসিদ আল-শরিয়াহর আলোকে উন্নয়ন: ইসলামিক মডেল' গ্রন্থটি দ্য ইসলামিক ভিশন অব ডেভলপমেন্ট ইন দ্য লাইট অব মাকাসিদ আল-শরিয়াহ এর বঙ্গানুবাদ ইসলামী আইনের সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে অথবা অনেক স্কলার ও ফকীহ দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে; যা সমস্ত মানুষের স্বার্থ সুরক্ষা, নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।

এ গ্রন্থে মানব কল্যাণ ও সমাজের উন্নতির সমস্ত উপাদানের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। যেমন- মানুষের সত্তা (Self), বিশ্বাস (Faith), বুদ্ধিমত্তা (Intellect), বংশধারা (Posterity) এবং সম্পদ (Wealth) এর উন্নয়ন।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করা স্বল্প মেয়াদে প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে বৈষম্য, পারিবারিক বিচ্ছেদ, কিশোর অপরাধ, অপকর্ম ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করতে পারে। অতএব, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা অবকাঠামোগত উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন নয় বরং উপরিউক্ত ৫টি বিষয়ের সমন্বিত উন্নয়নই ইসলামের প্রধান লক্ষ্য।

## লেখক পরিচিতি

১৯৩৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবে জন্ম নেয়া ড. এম উমর চাপরা ছাত্রজীবনে ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। ১৯৫০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৬ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম পাশ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯৬১ সালে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়, মিনিয়াপোলিস থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী স্কলার ড. এম উমর চাপরা ছিলেন জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (আইআরটিআই)-এর গবেষণা উপদেষ্টা। তিনি রিয়াদস্থ সৌদি অ্যারাবিয়ান মনিটারি এজেন্সি (এসএএমএ) এর সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন এবং দ্য ইউনিভার্সিটি অব কেনটাকী-লেক্সিংটন-এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকনোমিকস এর সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ও পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ- এর সহযোগী সম্পাদক এবং পাকিস্তান সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ- এ রিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর ওপর আন্তর্জাতিক বহু সম্মেলন ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৬ এবং প্রবন্ধ সংখ্যা শতাধিক। তাঁর অন্যতম গ্রন্থসমূহ হচ্ছে: 'টুয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারি সিস্টেম (১৯৮৫)', 'ইসলাম এন্ড ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট (১৯৮৮)', 'ইসলাম এন্ড দ্য ইকনোমিক চ্যালেঞ্জ (১৯৯২)', 'দ্য ফিউচার অব ইকোনোমিকস: এন ইসলামিক পারসপেকটিভ (২০০০)' এবং 'মুসলিম সিভিলাইজেশন: দ্য কজেজ অব ডিক্লাইন এন্ড দ্য নীড ফর রিফর্ম (২০০৭)'।

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-98129-2-0